প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

প্রকাশিকা :

লতিকা সাহা / মডার্ণ কলাম

১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা- ০০০০৯

মুদ্রক :

জি. শীল / ইম্প্রেসন প্রবলেম

২৭এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলকাতা-৭০০০০৫

ওয়াল্ট হুইটম্যান

ও

ল্যাংস্টন হিউজ

আমেরিকার দুই অমর কবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

হিমেল বাতাস বওয়া গ্রীষ্মের এক স্তব্ধ ভোরে, আমার স্ত্রী আর আমি কুয়েরনাভাকার দউইট দ. মরো সরণি ধরে হেঁটে চলেছি। ঢালু পাহাড়ি পথে আমরা এগিয়ে চলেছি পুরনো বাজারটার দিকে। দেখলাম ছোট একটা গাধা, কিংবা এখানকার লোকেরা যাকে 'বয়্যারও' বলে, তাতে চড়ে চলেছে একটা লোক। লোকটাকে ঠিক যিশুর মতো দেখতে। এ প্রসঙ্গে হয়তো মন্তব্য করা যেতে পারে, যিশুকে কেমন দেখতে ছিলো কেউ জানে না। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কয়েক সহস্র চিত্রকলা আর ভাস্কর্য থেকে যে রূপটা আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে, লোকটার মুখখানা ঠিক সেই রকম।

লোকটা আদিবাসী। গায়ে পুরনো কম্বলের আলখাল্লা, মাথায় চওড়া কানাওয়ালা টুপি। একটু লম্বাটে ধরনের আশ্চর্য সংবেদনশীল একটা মুখ। টুপির নিচে, মুখের দুপাশ থেকে ঝুলছে দীর্ঘ কোঁকড়ানো কালো চুলের গুচ্ছ। মেক্সিকোয় প্রায়ই যেমনটা চোখে পড়ে, তার মুখখানাও তেমনি করুণ বিষণ্ণতায় ভরা। কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর তার কুচকুচে কালো চোখদুটো, যাতে প্রতিফলিত হচ্ছে ভারি কাঠের দীর্ঘ ক্রুশটা বয়ে নিয়ে চলার বেদনা। গাধার জিন রেকাব, যাকিছু সাজসজ্জা সবই ঘরে তৈরি। জিনের দুপাশ থেকে ঝুলছে ছোট দুটো দুধের পাত্র। এ থেকেই বোঝা যায় লোকটা চাষী, নিজের ঘরে দোয়া ছাগলের দুধ বেচতে গিয়েছিলো শহরে। গাধার পিঠে চেপে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। স্মৃতিভারে, তার ভাবনার গভীরে সে এমনই মগ্ন যে আশে পাশের কিছুই লক্ষ্য করছে না।

অভদ্রের মতো সরাসরিই আমরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। না তাকিয়ে কোনো উপায় ছিলো না। তারপর লোকটা যখন

আমাদের অতিক্রম করে গেলো, স্তব্ধ বিস্ময়ে আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। কেননা এমন নির্জন পাহাড়ি পথে যিশুর জীবন্ত প্রতিমূর্তিকে গাধায় চড়ে যেতে দেখার দুর্লভ অভিজ্ঞতা অনেকের জীবনে এক বিরল ঘটনা।

দোকান-হাট করতে করতে আমরা এই ঘটনার কথাই বলাবলি করছিলাম, তারপর খাবারের ঝুড়িটা বয়ে নিয়ে চললাম প্লাজায়, শহর সুসংলগ্ন ময়দানের উন্মুক্ত কাফেতে—বাড়ি ফেরার আগে পর্যন্ত যেখানে বসে চমৎকার মেক্সিকান কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আমরা সকালের মিষ্টি রোদটা উপভোগ করতে পারবো।

প্লাজায় পৌঁছে দেখলাম কাফের সামনের দিকের ছোট টেবিলায় একা বসে রয়েছেন সেই ভদ্রলোক—ভারি সুন্দর দেখতে, বুদ্ধিদীপ্ত নম্র ব্যবহারের জন্যে যাকে আমরা বরাবরই ভাবতাম নিশ্চয়ই 'নির্বাসিত' কেউ। ওঁকে দেখে, এক সঙ্গে কফি পান করতে পারবো ভেবে আমরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম।

কুয়েরনাভাকায় অবশ্য নানান ধরনের নির্বাসিত ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা বছরের পর বছর এখানে বসবাস করে আসছেন—প্রথমে স্পেনের প্রজাতন্ত্রী, তার আগে জার্মান, তারও আগে প্রায় সমস্ত ল্যাটিন আমেরিকা থেকে নির্বাসিত হয়ে আসা ব্যক্তিরা। কেননা কেউ যদি নির্বাসিত হয়ে থাকতে চান, তাহলে কুয়েরনাভাকার মতো এমন সুন্দর শান্ত শহর আর কোথায় পাবেন? কিন্তু গত পাঁচ বছর ধরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকেও নানা ধরনের মানুষ—নির্বাসিত উদ্বাস্তু, সদ্য মুক্তি-পাওয়া রাজবন্দী, কারাগারের আতঙ্ক আর নির্জনতাকে যাঁরা এখনও ভুলতে পারেননি; কালো-খাতায় নাম ওঠা সাহিত্যিক, সর্বত্রই যাঁদের হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে; প্রতিবাদ-পত্রে সাক্ষর দিয়েছেন এমন সব অভিনেতা কিংবা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ যাঁরা আমেরিকায় জন্মেছেন অথচ বর্তমানে সেখানে যা ঘটছে, তার আতঙ্কেই দেশে ছেড়ে চলে এসেছেন এই কুয়েরনাভাকায়। এক সময়ে, খুব বেশি দিন আগের

কথা নয়, যুক্তরাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত হয়ে আসা ব্যক্তিদের এখানে ছোটখাটো একটা উপনিবেশও ছিলো। কিন্তু সেই উপনিবেশ আজ পরিত্যক্ত—যেহেতু উদ্বাস্তুরা একটু স্বচ্ছলতার মোহে হয় একে একে চলে গেছে মেক্সিকো শহরের দিকে, নয়তো গৃহকাতরতা আর দারিদ্র্যের চাপে ভবিষ্যৎ জীবনে যাই ঘটুক না কেন তার মোকাবিলা করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরে গেছে দেশে।

আমরা যখন ছিলাম, সেই গ্রীষ্মে কেবল নির্বাসিতরাই রয়ে গেছেন—কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে, সেই মুহূর্তে কুয়েরনাভাকায় উনিই শেষ নির্বাসিত আমেরিকান। দুঃখ আর বিষণ্ণতায় ভরে ওঠা একটা মানুষ, যাঁকে নিজের আর নিজের দেশের মাঝখানের বেশ কয়েকটা সেতুকে দগ্ধ করে আসতে হয়েছে অতিক্রম করে আসতে হয়েছে যে পথ—আজ তা অসম্ভব জটিল আর দুরাধিগম্য বললেই চলে। তবু নিজের দুঃখ হতাশাকে উনি ঢেকে রাখতে পেরেছেন নিজেরই প্রতি এক ধরনের বাঁকা বিদ্রূপ আর তরল হাস্য-পরিহাস দিয়ে। অন্যের চোখে যে করুণা কুড়োচ্ছেন এ সম্পর্কে যে শুধু সচেতন তাই নয়, এর জন্যে উনি নিজেকে অপমানিতও বোধ করেন। ফলে আমাদের অভিবাদন জানাতে গিয়ে নিজের প্রতি প্রচ্ছন্ন তিক্ততাকে উনি কিছুতেই আড়াল করে রাখতে পারলেন না।

কফির ফরমাস দেবার পর আমার স্ত্রী ওঁকে বললো, 'বাজারে আসার পথে আমরা যিশুকে গাধায় চড়ে যেতে দেখলাম।'

'আচ্ছা।'

চারদিকে পাহাড় ঘেরা দূরের দৃশ্যালী, কোর্টেজের পুরনো প্রাসাদ, সবুজ আর সাদা রোদ্দুরের কারুকার্যকরা আঙিনার দিকে তাকিয়ে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আমি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝালাম।

উনি বললেন 'আমি কিন্তু একটু বিস্মিত হচ্ছি না। মেক্সিকোয় সবই সম্ভব। ভেবে দেখুন না একবার, চারশো বছর আগে খৃশ্চান স্প্যানিয়ার্ডরা এই দেশটাকেই ক্রুশকাঠে ঝুলিয়ে ছিলো। জাতীয় স্তোত্র

বলতে তখন চাবুকের গানকেই বোঝানো হতো। সুতরাং দউইট দ: মরো সরণিতে যিশুকে যদি দেখেই থাকেন তাতে এত অবাক হবার কি আছে। এ রকম একটা জায়গাতেই তো ওঁকে দেখাটা স্বাভাবিক।'

'আপনার কোনো কৌতূহল হচ্ছে না?'

'এ পৃথিবীতে খুব কম জিনিসই আমার কৌতূহল জাগায়। আসলে কি জানেন—নির্বাসিত যাঁরা, তারা বিশ্বনিন্দুক হতে বাধ্য। তবে আমার সবচেয়ে অবাক লাগছে, আপনারা যাঁরা নিজেদেরকে বাস্তববাদী বলে মনে করেন, ঘটনাটা তাঁদের প্রভাবিত করতে পেরেছে বলে।'

আমার স্ত্রী বললো, 'একজন আদিবাসীকে আমার গাধায় চড়ে যেতে দেখেছি, এটা কিন্তু বাস্তব।'

'হ্যাঁ যেটা দেখেছেন, সেটা বাস্তব। কিন্তু আমাকে যেটা বলছেন, সেটা যিশু।'

এ সম্পর্কে আমরা আরও কিছুক্ষণ আলোচনা করলাম। নির্বাসিত ভদ্রলোক মৃদুভাবেই বিদ্রূপের খোঁচায় আমাদের অনুভব করাতে বাধ্য করলেন যে কত সহজেই না আমরা কোনো কিছুকে বিশ্বাস করে নিই। শেষ পর্যন্ত প্রায় ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতেই স্বীকার করে নিলাম যে ওটা আমাদের মনের ভুল।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, ব্যাপারটাও মুছে গেছে আমাদের মন থেকে। একদিন পথেই ডাক্তার আর্নো সেরেন্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো, কথায় কথায় আমি তাকে জানালাম যে দীর্ঘদিন ধরে আমি একটা ফোঁড়ায় বেশ কষ্ট পাচ্ছি। সেরেন্ত বললো আমি যদি তার চেম্বারে যাই তাহলে সে ফোঁড়াটা চিরে দিতে পারবে। আমি জানি ফোঁড়াটা তেমন মারাত্মক কিছু নয়, তবে সেরেন্ত আমেরিকা বা এ পৃথিবীর নানান কিছু সম্পর্কে গল্প শুনতে দারুণ ভালোবাসে। নিজেও সে যেমন মজলিসি, তার কথা বলার ভঙ্গিটাও তেমনি চমৎকার। তাই সেদিনই তার চেম্বারে যাবো বলে কথা দিলাম।

ডাক্তার সেরেন্তেও একদিন নির্বাসিত হয়ে এখানে এসেছিলো। সে অবশ্য অনেকদিন আগের কথা, এতদিন আগে যে এখন প্রায় ভুলেই গেছে। আজ সে কুয়েরনাভাকারই একজন, নিজের স্বদেশভূমি স্পেনে ফেরার আকাঙ্খা তার মনের গহন নিভৃতে বহুকাল আগেই নিভে গেছে। তার ব্যস্ত জীবন এখন ওই ছোট্ট কালো ব্যাগটারই মধ্যে ঠাসা। মেক্সিকোর গরীব রুগীরা নিয়মিত পয়সা দিতে না পারলেও, পানাসক্ত ধনী আমেরিকানদের কাছ থেকে যে টাকা পায়, তাতে তার সংসার বেশ ভালোভাবেই চলে যায়।

প্রজাতন্ত্রী স্পেনে আর্নো সেরেন্ত ছিলো পদাতিক বাহিনীর একজন সেনাধ্যক্ষ। শেষে হাজার হাজার মানুষের মতো সেও একদিন সস্ত্রীক পাইরেনিস পর্বতমালা অতিক্রম করে পালিয়ে এলো, সুদীর্ঘ পথপরিক্রমা শেষ হলো মেক্সিকোয়। পিঠে জামাকাপড়ের সামান্য একটা পুঁটলি, পকেটে একটাও পয়সা নেই—না পেনি, না ফ্রাঁ, না সেন্তাভো। এসব অবশ্য দীর্ঘ পনেরো বছর, কি তারও আগের কথা—যখন সে আদিবাসীদের ছোট ছোট গ্রামগুলোয় চিকিৎসা করতো, যেখানে পৌছতে গেলে খচ্চরের পিঠে চড়ে যাওয়া ছাড়া গাড়ি চলার মতো কোনো পথ ছিলো না। আজ সে লব্ধ-প্রতিষ্ঠিত। অবস্থা এমনই স্বচ্ছল যে গাড়ি বাড়ি আর চেম্বার হয়েছে। একজন ধাত্রীও আছে। দিনে তিনবার খাওয়া জোটো, সময় সময় পকেটে একসঙ্গে বেশ কিছু টাকার স্পর্শও পাওয়া যায়। একদিন যে স্পেন তার মনের গহনে স্বপ্নেরই মতো উঁকি-ঝুঁকি দিতো, সেই স্পেনের আশা-আকাঙ্খাকে কসাই ফ্রাঙ্কো যতই নিপুন ভাবে হত্যা করছে, ডাক্তার সেরেন্তেও নিজেকে ততই দূরে সরিয়ে নিয়েছে এবং এখানেই নিজের অস্তিত্বকে টি কিয়া রাখার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। 'একদিন নিশ্চয়ই ফিরবো'—মনের নিভৃতে অবরুদ্ধ থাকা এই ভাবনাটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার বর্ষপঞ্জীর কোনো পৃষ্ঠাতেই স্থান পায়নি।

বাজারটা পেরিয়ে আর্নো সেরেন্তের চেম্বার। বাদামী রঙের বেশ পুরনো একটা হলঘরের মধ্যে দিয়ে একসারি সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। সিঁড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে লম্বা একটা বেঞ্চি আর কিছু চেয়ার পাতা, এটাই প্রতীক্ষা করার ঘর। সময় কাটানোর জন্যে রয়েছে ইংরেজী আর স্প্যানিশ ভাষায় জীর্ণ হয়ে আসা একগাদা পুরনো পত্রিকা। তিনটে নাগাদ আমি যখন পৌঁছলাম, দেখলাম গাধায় চড়ে যাওয়া যিশুর মতো দেখতে সেই লোকটাও বিষণ্ন মনে বেঞ্চির এক প্রান্তে চুপচাপ বসে রয়েছে।

সেদিনের মতো এবার আর ভোরের সূর্যালোকের জাদুকরী কোনো প্রভাব নয়, খুব কাছ থেকেই সরাসরি লোকটার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। আবিষ্কার করলাম প্রথম দেখায় আমার স্ত্রী আর আমি, কেউই ভুল করিনি। জীর্ণ মলিন আলখাল্লায় লোকটাকে সত্যিই রক্ত-মাংসে গড়া যিশুর মতো দেখাচ্ছে।

মেক্সিকান কোনো মুখের অভিব্যক্তিতে দুঃখ বা বিষণ্নতা ফুটে ওঠাটা আদৌ কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু দুঃখ কত গভীর হলে তবেই কারুর বেদনা-কাতর মুখ এমন আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠতে পারে, এই আদিবাসী মানুষটাকে না দেখলে কোনোদিনই তা বোঝানো সম্ভব নয়। তার দুঃখের এই রহস্যকে জানার জন্যে আমি ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ ভাষায় জিগেস করলাম সে ডাক্তারের জন্যে অপেক্ষা করছে কিনা।

লোকটি জবাব দিলো, 'না আমার মেয়ের জন্যে।'

তারপর আমাকে বুঝিয়ে বললো যে মেয়েটি খুব অসুস্থ। ও আর ওর মা ভেতরে রয়েছে। অসম্ভব ধৈর্যশীল, নিতান্ত সাধারণ ধরনের মেক্সিকানদের মতো সেও একজন। মাতৃভাষায় আমাকে কথা বলতে দেখে, তা সে যত বাজে ভাবেই হোক না কেন, লোকটা তার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার আমার কাছে উন্মুক্ত করে দিলো। নিটোল অথচ শ্রুতিমধুর

তার কোমল কণ্ঠস্বর। ছোট মেয়েটি যে তার কাছে এ পৃথিবীর সব একথা আমাকে বলার আগেই বুঝতে পেরেছিলাম সন্তানের জন্যে সে কত উদ্বিগ্ন। মেয়ের বয়স বারো। একই সঙ্গে দুর্ভাগ্য এবং সৌভাগ্যবশত তার আর অন্য কোনো সন্তান নেই। দুর্ভাগ্য এই কারণে—তার এমন কোনো পুত্রসন্তান নেই যে বৃদ্ধ বয়সে সংসারের দায়িত্বভার নেবে, বিশেষ করে তার মতো নিঃস্ব একজন চাষী, যার ছোট্ট একটা কুঁড়ে, সামান্য এক টুকরো জমি, কয়েকটা ছাগল ছাড়া আর কিছু নেই। তবু তার সৌভাগ্য—এই একটি মাত্র সন্তান বলে তাদের যাকিছু স্নেহ-ভালোবাসা উজাড় করে দিতে পেরেছে, যেমন নদীর পলিসমৃদ্ধ উপত্যকার একটি মাত্র গাছ পরিমিত যত্নে আরও সুন্দর আরও সতেজ হয়ে ওঠে, তাদের কাছে পরিপূর্ণ ভালোবাসায় মেয়েটিও ঠিক সেই রকম।

লোকটির প্রতিটা শব্দ যে আমি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলাম, তা কিন্তু নয়। তবে অনেক বেশি বুঝতে পারলাম মা আর মেয়ে যখন ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। মেয়েটি এমন আশ্চর্য রূপসী যে আমার শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসার জোগাড়। ওর মাও ঠিক একই ধরণের রূপসী। সম্ভবত ডাক্তার সেরেন্তর ঘরে এমন একটা কিছু ঘটেছে যার আতঙ্ক তখনও জড়িয়ে রয়েছে দু-জনেরই চোখে মুখে, আর চাপা বেদনায় মার চোখের কোলে টলটল করছে দু-ফোঁটা অশ্রু। এতে রূপের দীপ্তিকে এতটুকু ম্লান না করে বরং আরও অতলস্পর্শী করে তুলেছে। পরিবারের কর্তা হিসেবে লোকটির ডাক পড়ায় ডাক্তারের ঘর থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত মা-মেয়ে অপেক্ষা করে রইলো। আমি ওদের সঙ্গে কথা কইতে পারলাম না, মাঝে মাঝে কেবল কয়েকবার চোখ তুলে তাকালাম। তারপর এক সময়ে লোকটি ফিরে এলো। তার চোখেও সেই একই আতঙ্ক, তবু সৌজন্য বোধের প্রয়োজনেই সে কোনো রকমে বললো:

'অসংখ্য ধন্যবাদ, সেনর—বিদায়।'

ওরা যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছে, ডাক্তার সেরেন্তের ঘরে আমার ডাক পড়লো।

ফোঁড়ার ব্যাপারটা মিটতে খুব একটা সময় লাগলো না। আমি জিগেস করলাম, 'আমার ঠিক আগেই যে লোকটা এসেছিলো, তুমি কি লক্ষ্য করেছো আর্নো, ওকে কার মতো দেখতে?'

'আমার তো ধারণা, অন্যান্য আদিবাসীরা যেমন হয় ওকে তাদেরই মতো দেখতে।'

আমি তখন সেদিন ভোরে দউইট দ. মরো সরণিতে ওকে দেখে আমাদের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো তার কথা বললাম।

'লেখক হওয়ার এই একটা সুবিধে, যা বাস্তব সেটা তোমরা চোখে দেখতে পাও না। অবশ্য আমার ধারণা এটা তোমাদের প্রয়োজন।'

'একজন ডাক্তারের কাছে যতটা প্রয়োজন, একজন লেখকের কাছে ততটা প্রয়োজন নাও হতে পারে। তবে মুশকিল কি হয়েছে জানো, আজকাল বহু লেখক সত্যিকারের দেখার চোখটাই হারিয়ে ফেলেছে।'

'যেহেতু, তোমরা যত পারো দেখতে চাও, আর আমরা যত কম দেখতে পাই মনের দিক থেকে ততই শান্তি। যাগ্‌গে ওসব কথা—আমার স্ত্রী জানতে চেয়েছে কাল নৈশভোজের আসরে তোমরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে কিনা, কেননা কালই মেক্সিকো শহর থেকে একজন তরুণ শ্রমিক-নেতা আসছে ; ছেলেটি সত্যিই যেমন সৎ, তেমনি সাহসী। তাছাড়া ও-ও তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।'

'আচ্ছা, তোমরা মেক্সিকানরা সব সময় ওই 'সাহসী' শব্দটা ব্যবহার করো কেন বলো তো, অন্তত যেখানে প্রয়োজন নেই?" খোঁচা-দেওয়ার ভঙ্গিতেই আমি বললাম।

'প্রথমত, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই জানাচ্ছি যে আমি মেক্সিকান নই, স্প্যানিয়ার্ড। দ্বিতীয়ত, আমাদের ভাষায় 'সাহসী' শব্দটা যথাযথ ভাবেই প্রযোজ্য। ইংরাজীতে অনুবাদ করতে গিয়েই শব্দটা তোমার

কাছে অমন বেখাপ্পা মনে হচ্ছে। তার প্রথম কারণ—এর প্রকৃত প্রতিশব্দ তোমাদের ভাষায় নেই, দ্বিতীয় কারণ—সাহসিকতার প্রকৃত তাৎপর্য তোমাদের ঠিক পছন্দও নয়।'

'এই জাতীয় শব্দ-কচকচির চাইতে তোমাদের বাড়িতে রাতের নেমতন্নে যোগ দিতে পারলে সত্যিই খুব খুশি হবো, কেননা তোমার স্ত্রী আর বাগান—দুটোই ভারি সুন্দর। আর তার চাইতেও লোভনীয় তোমার বাড়ির খাবার।'

'নাঃ, তোমরা, উত্তর আমেরিকান লোকেরা দেখছি সবাই সমান,' হাসতে হাসতেই ডাক্তার জবাব দিলো। 'সুযোগ পেলে অপমান করতে ছাড়ো না। তাহলে ওই কথাই রইলো—ঠিক সাতটার সময় নিশ্চয়ই আসছো।'

আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম। সবে উঠতে যাবো, হঠাৎ মনে পড়ায় মেয়েটি কথা জিগেস করলাম, 'নিশ্চয়ই ও তেমন অসুস্থ নয়? আশা করি শিগগিরই সেরে উঠবে।'

কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবেই ডাক্তার জবাব দিলো, 'আমার ধারণা ও খুবই অসুস্থ।'

'তাই নাকি! কিন্তু নিশ্চয়ই সারানো সম্ভব?'

'আমার মনে হয়—না।' শান্তস্বরেই ডাক্তার প্রতিবাদ জানালো।

'তার মানে তুমি বলতে চাও ও এমনই মারাত্মক ধরনের অসুস্থ যে সারানো সম্ভব নয়?'

'ঠিক তাই।'

'এ কথা তুমি কেমন করে বলছো, আর্নো?' আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না।

'এছাড়া আর অন্য কিভাবে বলবো বলো? আমি ডাক্তার, দিনের মধ্যে বারো থেকে পনেরোটা ঘণ্টা আমার কেটে যায় রুগী ঘাঁটতে ঘাঁটতেই। এর মধ্যে অনেকেই মারা যায়। অন্যান্য জায়গার তুলনায় মেক্সিকোয় আবার মারা যায় সব চাইতে বেশি।'

'তার মানে মেয়েটিও মারা যাবে?'

'আমার ধারণা তাই।'

'না-না, তা হয় না। এমন সুন্দর, এত অল্প বয়সে ও মারা যাবে, এ কিছুতেই হতে পারে না।'

'উত্তর আমেরিকার প্রিয় বন্ধু, মেয়েটি সত্যিই খুব অসুস্থ—এর সঙ্গে সুন্দর বা অল্প বয়েসের কোনো সম্পর্ক নেই।'

'ধরেই নিচ্ছি ও খুব অসুস্থ, কিন্তু এটা তো মধ্যযুগ নয়? আমরা এমন একটা কালে বাস করি যেখানে জীবাণু-প্রতিরোধকারী নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর সব ওষুধ বেরিয়েছে, তাছাড়া শল্যচিকিৎসারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তুমি ইচ্ছে করলে ওর জন্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা করতে পারো।'

'কিছুই করতে পারি না।' জীবাণু-নাশক ওষুধ দিয়ে যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করতে করতে ডাক্তার সেরেন্ত তেতো গলায় জবাব দিলো। 'হতে পারে এটা জীবাণু-প্রতিরোধকারী একটা যুগ। কিন্তু এখানে আমরা যেভাবে বাস করি, সেটা মধ্য যুগের চাইতে আদৌ উন্নত ধরনের কিছু নয়। তাছাড়া, তোমার অনুভূতি-প্রবণতার বহর দেখে এখন তো আমার তোমার সততা সম্পর্কেই সন্দেহ হচ্ছে।'

'এবার কিন্তু তুমি আমাকে অপমান করতে ছাড়ছো না।'

'আদৌ না। প্রকৃত ঘটনা যেটা—আমি বেঁচে আছি এবং এখানে কাজ করছি। কিন্তু যেহেতু তুমি অত্যন্ত সাধারণ একজন চাষীকে গাধায় চড়ে যেতে দেখে বিচলিত হয়েছো…অবশ্য এটা সত্যি যে ছোট মেয়েটা নিঃসন্দেহে রূপসী। কিন্তু মেক্সিকোয় সেটাও এমন কোনো বিরল ঘটনা নয়, তাই তোমার ধারণা আমি ইচ্ছে করলে মেয়েটাকে বাঁচাতে পারি, কিন্তু করছি না।'

'কিন্তু সত্যিই কি তুমি পারো না, আর্নো?' কাতর স্বরে আমি মিনতি করলাম।

'না। প্রথমত ও বিশ্রী রকমের বৃক্ক প্রদাহে ভুগছে। মূত্রগ্রন্থির

একটাকে অতি অবশ্যই বাদ দিতে হবে। তা সত্ত্বেও অন্যটা যে কতদিন ভালোভাবে কাজ করতে পারবে কেউ বলতে পারে না।'

'তবু তো সম্ভাবনা আছে, অন্তত তুমি যা বললে।'

'আমি কিছুই বলিনি। দোহাই তোমার, নিজের ভাবনাকে আমার ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা কেরো না। ওর বাবা-মা কেমন করে অস্ত্রোপচারের খরচ যোগাবে, যেখানে এখানে এসে আমাকে দেখানোর টাকাই ওদের নেই? আমার পারিশ্রমিক পঞ্চাশ পেসো, অথচ ওরা যদি কখনও একটা পেসোও দিতে পারে তো সেটাই আমার কাছে যথেষ্ট। মেক্সিকো শহরে যাওয়া আসার খরচ ছাড়া, শুধু অস্ত্রোপচারের খরচই পড়বে দু হাজার পেসো। তার ওপর ওখানে থাকা, হাসপাতাল, অ্যানিসথোসিয়া আর ওষুধে যে কত খরচ পড়বে কে জানে! তাছাড়া খরচের কথা যদি বাদও দিই, তুমি কি মনে করো ওরা অস্ত্রোপচারের অনুমতি দেবে?'

'এতে যদি মেয়েটির প্রাণ বাঁচানো যায়, তাহলে ওরা অনুমতি দেবে নাই বা কেন? ওরা নিশ্চয় মেয়েটাকে খুব ভালোবাসে। ওর বাবা নিজে আমাকে বলেছে মেয়েটাই ওদের একমাত্র সন্তান।'

'তুমি সবকিছুকে যত সহজ ভাবো, আসলে ততটা সহজ নয়। বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে আঘাত বা অপমান করতে চাই না··· বরং নিজেরই ওপর আমার রাগ হয়, আর রাগ হয় যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, তার ওপর। তোমাকে আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তোমার দেশের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্টের বাজে দিকগুলোকে তুমিও অতিক্রম করতে পারোনি···অন্তত মানসিক দিক থেকে যেসব দিকগুলো পৃথিবীকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে, সেগুলো তো নয়ই। পঞ্চাশ বছর ধরে তোমরা এই শিক্ষাই পেয়ে এসেছো যে অস্ত্রোপচারে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়, এমন কি যদি তার প্রয়োজন না থাকে তবুও। অথচ অত্যন্ত সাধারণ, গরীব মানুষ—যারা কখনও হাসপাতালই দ্যাখেনি, অস্ত্রোপচার তাদের কাছে মারাত্মক ধরনের একটা

ভয়ের ব্যাপার। অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে, এমন কি তার আগেও কেউ যদি মারা যায়, ওরা ধরে নেয় যে তাকে খুন করা হয়েছে। যাই হোক, এসব প্রশ্ন বাদ দিলেও, অর্থনৈতিক দিকটাই সব চাইতে বড় কারণ।'

'টাকা আমি দিতে পারি···'

'তুমি দেবে! কি বলছো ভেবে দেখেছো একবার? আমার প্রায় একশো জন রুগী। যাদের অস্ত্রোপচার করা অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন, তাদের অস্ত্রপচারের টাকা তুমি দেবে? তুমি কি নিজেকে ঈশ্বর ভাবো নাকি—কে মরবে আর কে মরবে না তার সিদ্ধান্ত নেবে তুমি? না কি উত্তর আমেরিকানদের এটাও একটা নতুন চাল—বাঁচার যোগ্য যে মেক্সিকান তাকে টি কিয়ে রেখে মজা দেখবে···'

'বিশ্বাস করো আর্নো, এসব আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'না, আমি জানি তুমি ভাবোনি। সত্যিই আমি দুঃখিত। কিন্তু তোমার কি ধারণা, অনুভূতি বলে কোনো পদার্থ আমার নেই? তুমি কি ভাবো, বাবা মা মেয়েকে আমি দেখিনি? দেখেছি। প্রতিদিনই দেখছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন আমি তোমার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করলাম, বিশেষ করে ইতিমধ্যেই তোমাকে যখন যথেষ্ট নির্যাত সহ্য করতে হয়েছে···'

'তুমি যে আমার সঙ্গে কোনো রূঢ় ব্যবহার করোনি সেটা আমি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি।'

'কেমন করে বুঝলে? এখানে আমি এই পনেরো বছর ধরে বাস করে আসছি, অথচ আজ পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারলাম না···এখনও আমি ভুল করি। কিন্তু কেন জানো? যেহেতু আমি নিজে কখনও কৃষক ছিলাম না, যেহেতু আমি জীবনে ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত দারিদ্র কি জিনিস কখনও জানি না। এই তো গতকালই সকালে একজন চাষী তার বউ আর ছোট দুটো ছেলে-মেয়েকে নিয়ে এসেছিলো। বাচ্ছাদুটোই গত কয়েক মাস ধরে রক্ত আমশায় ভুগছিলো। কিন্তু

সারাটা সংসার ট্যাঁকে করে ত্রিশ মাইল পথ ঠেঙিয়ে শেষ পর্যন্ত আতঙ্ক জড়ানো চোখে যখন এখানে এসে পৌঁছলো, আমি তখন আরও ভালোভাবে পরীক্ষাব জন্য ছুটো শিশি দিয়ে বললাম এতে করে বাচ্ছাছুটোর পায়খানা নিয়ে আসতে। সব শুনে লোকটা এমন ভাবে আমার দিকে তাকালো যেন কোনো আহত পশু। আজ এই পনেরো বছরেও আমি তাকে বুঝতে পারিনি। একগাদা রুগী, অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যে লোকটার কথা আমার মনেই ছিলো না। ও কিন্তু আর ফিরে আসেনি। অথচ কেন বলতে পারো? যেহেতু ওর কাছে আমি ঈশ্বরের মতো। আমি যখন ওকে বাচ্ছাদের পায়খানা আনতে বললাম—ও ধরেই নিলো হয় আমি ওর সঙ্গে মারাত্মক ধরনের কোনো ঠাট্টা করছি, নয়তো ওকে অপমান করার জন্যেই ও কথা বলেছি। কিন্তু পরীক্ষার জন্যে এটা যে আমার বিশেষ প্রয়োজন সে কথা ও জানে? অণুবীক্ষণ যন্ত্র কি জিনিস ও কি কখনও চোখে দেখেছে? এতক্ষণে বাচ্ছাছুটো হয়তো মারাই গ্যাছে এবং সে ত্রুটি আমারই, যেহেতু সাধারণ মানুষের ভয় বা আতঙ্ক কি জিনিস আমি কোনোদিনই বুঝতে পারিনি। যাই হোক, আর নয়, অনেক বকবক করেছি। বিশেষ করে, তুমি যখন অতিথি, তখন আমার উচিত আরও ভদ্রভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলা।'

'যেভাবে খুশি তুমি কথা বলতে পারো,' আমি হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। 'তাহলে কাল সাতটায় আমরা তোমার ওখানে হাজির হচ্ছি।'

সেরেন্তের ডাক্তারখানা থেকে হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ খেয়াল হলো, আসবাবপত্র তৈরির দোকানটায় একবার দেখা করে যাওয়া দরকার। আমার স্ত্রীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন এখানকার এই অবকাশের দিনগুলোয় কাদামাটির কোনো ভাস্কর্য গড়বে। তাই কয়েকদিন আগে কাঠের দোকানের মালিককে বলেছিলাম আমাদের জন্য একটা কাঠামো

তৈরি করে দিতে। আমরা চেয়েছিলাম জিনিসটা খুব সাধারণ হবে—নিচে চৌকো একটুকরো কাঠের ওপর শুধু একটা দণ্ড বসানো থাকবে, যাকে আঁকড়ে গড়ে উঠবে মাটির মূর্তিটা। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলেছিলো হু একদিনের মধ্যে ওটা তৈরি করে রাখবে।

দোকানে পৌঁছে দেখলাম কাঠামোটা ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়ে গেছে। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় দোকানটাকে ঠিক অনেকদিন আগে আঁকা কোনো ছবির মতো মনে হচ্ছে। চামড়ার সজ্জাবরণী পরে হুজন কারিগর করাত বাটালি তুরপুণ নিয়ে কাজ করছে, গত চারশো বছর ধরে যে সব যন্ত্রপাতির আজও কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু তাদের কর্মতৎপর বলিষ্ঠ বাহু, মগ্ন হয়ে থাকা বাদামী মুখ, নানা ধরনের কাঠের টুকরো আর ছড়ানো যন্ত্রপাতির মধ্যে ফুটে ওঠা উষ্ণ, কর্মচঞ্চল জীবনের ছবিটা আমার ছোটবেলার স্মৃতিকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এ আমার কল্পনা নয়—আমি নিজে একসময় ছুতোরদের সঙ্গে কাজ করেছি, ইউরোপ, এশিয়া, আমার নিজের স্বদেশভূমি—মেইন ভেরমণ্ট আর ক্যালিফোর্নিয়ায়, তাদের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি, এমন কি কারাগারের বন্দীদেরও ঠিক একই মগ্নতায় কাজ করতে দেখেছি, দেখেছি কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের নিপুণতাকে ফুটিয়ে তোলার এক নিঃশব্দ প্রয়াস।

'আপনার জিনিসটা তৈরি হয়ে গ্যাছে, সেনর', আমাকে দেখে হু-জনের মধ্যে বয়স্ক ছুতোরটি বললো। তারপর সেই কাঠামোটা তুলে ধরলো আমার সামনে। হাতের কাজের নৈপুণ্যে জিনিসটা এমন আশ্চর্য সুন্দর হয়েছে যে আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। সবটাই মেহগনি কাঠের তৈরি এবং এমন চমৎকার পালিশ করা যেন মূল্যবান কোনো আসবাবপত্র।

'আপনি চার পেসো দেবেন, সেনর।'

অর্থাৎ আমেরিকান হিসেব অনুযায়ী বত্রিশ সেণ্ট। কিন্তু আমার

মুখের অভিব্যক্তি দেখে লোকটা ভয়ে ভয়েই জানতে চাইলো দাম বড্ড বেশি বলে মনে হচ্ছে কি না। আমি বললাম, না, এত ভালো কাঠ আর এমন নিখুঁত হাতের কাজের তুলনায় দামটা আদৌ বেশি নয়। বরং সামান্য এই জিনিসটা এমন সুন্দর ভাবে তৈরি করতে গিয়ে তাকে কত না মেহনত করতে হয়েছে শুনে সে বললো :

'কেন সুন্দর ভাবে তৈরি করবো না, সেনর ?'

আমি জানি এ প্রশ্নের কোনো জবাব নেই, কেননা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে ঐতিহ্য, যে অভিজ্ঞতা, যে সৌন্দর্যবোধ এরা লালন করে আসছে—শুধু এরাই নয়, সারা মেক্সিকো জুড়ে যেসব শ্রমিক দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর সব কারুকার্য করছে কিংবা বড় বড় বাড়ি তুলছে, যে বাড়িগুলো তামাম দুনিয়ায় অন্য যে কোনো বাড়ির চাইতেও সুন্দর, সেইসব শ্রমিকদের সম্পর্কেই বা কতটুকু জানি। দাম মিটিয়ে দিয়ে কাঠামোটা নিয়ে আমি বাড়ি চলে এলাম।

পরের দিন যাজকের সঙ্গে দেখা হলো। বলতে গেলে এক রকম আকস্মিক ভাবেই দেখা হয়ে গেলো। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় পাহাড় দিয়ে ঘেরা পুরনো গির্জা সুসংলগ্ন বিরাট আঙিনায়, স্ত্রীর সঙ্গে বাচ্চারা ছুটোছুটি করছে সবুজ ঘাসে। আর আমি একা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি গির্জার ভেতরের দুর্লভ কারুকার্য, মণিমুক্তো খচিত প্রাচীন প্রতিমূর্তি, সোনা রুপোর বাতিদান, ঝালর, দেওয়া রেশমী পরদা আর নানান মূল্যবান পাথর। বাইরের উজ্জ্বল সূর্যালোক আর মেক্সিকান জীবনের চরমতম দারিদ্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেতরের ছায়াচ্ছন্ন আঁধারে আমি এমন মগ্ন হয়েছিলাম যে গির্জার প্রধান ধর্মযাজক কখন নিঃশব্দে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন আমি টেরও পাইনি, চমক ভাঙলো ওঁর কোমল কণ্ঠস্বরে :

'আমাদের গির্জাটা আপনার ভালো লেগেছে, সেনর ?'

'ভালো লেগেছে কি না বলতে পারবো না। তবে এর কারুকার্য আমাকে নিঃসন্দেহে মুগ্ধ করেছে।'

'ওঃ, সেনর তাহলে খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী নন!' এমনভাবে উনি কথাটা বললেন, যা প্রশ্নের চাইতে বরং স্বগোক্তিরই মতো মনে হলো। তবে ওঁর ইংরাজী উচ্চারণ সত্যিই ভারি চমৎকার, এবং এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করায় উনি বললেন :

'হ্যাঁ, ইংরাজী আমি স্পেনেই শিখেছি।'

'কিন্তু আপনি তো স্প্যানিয়ার্ড নন, আপনি তো মেক্সিকান?'

পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস, যাজকদের মতো দেখতে হলেও, গায়ের রং আর গোলগাল, বলিষ্ঠ চেহারা দেখেই আমি প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ, কিন্তু ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত—যখন মেক্সিকান সরকার গির্জাকে খুব একটা ভালো চোখে দেখতেন না, আমি তখন সেখানে ছিলাম। এখানের চাইতে স্পেনের অবস্থা তখন অনেক ভালো।'

কিন্তু সে সময়ে স্পেনে যা ঘটেছিলো, সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করতে না দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তবু নিজে থেকে কোনো প্রশ্ন করলাম না। প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যেই আমি সংক্ষেপে ওঁকে গাধায় চড়ে যাওয়া যিশুর মতো দেখতে লোকটা আর তার মেয়ের অসুস্থতার কথা বললাম, এবং উনি লোকটাকে কোনো রকম সাহয্য করতে পারেন কি না জানতে চাইলাম।

উনি কিছুটা অবাক হয়েই প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু একজন যাজককে আপনি এসব কথা জিগেস করছেন কেন?'

'যেহেতু আমার ধারণা সাহায্য করার মতো লোকটার আর কেউ নেই।'

'কিন্তু লোকটা…বিশেষ করে সে যখন মেক্সিকান, ঈশ্বরই ওকে সাহায্য করবেন।'

'হয়তো করবেন, কিন্তু তাতে তো আর ওর মেয়েটা সেরে উঠবে না?'

'আপনি কি সুনিশ্চিত, সেনর? ঈশ্বর যদি চান ওর মেয়ে বেঁচে থাকুক, তাহলে ও নিশ্চয়ই বাঁচবে, আর ঈশ্বর যদি চান ওর মেয়ে মরবে, তাহলে ও নিশ্চয়ই মরবে। এ সবই বিধিলিপি, আপনার বা আমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে না।'

'কিন্তু এসব কি অতীত দিনের ভ্রান্ত ধারণা নয়?' প্রতিটা শব্দই আমি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কেটে কেটে উচ্চারণ করলাম। 'আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে—জীবাণু প্রতিশোধক নানা ধরনের ওষুধ বেরিয়েছে, বহু হাসপাতাল হয়েছে, অস্ত্রোপচারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে—নিশ্চয়ই আপনি অস্বীকার করবেন না যে এর দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় না।'

'আমরা কেবল পরস্পরকে বিভ্রান্ত করার জন্যেই তর্ক করছি, সেনর।' এতটুকু ক্ষুব্ধ না হয়ে হাসতে হাসতেই উনি বললেন। 'আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?'

'এটা কিন্তু অত্যন্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন, তাই নয় কি?'

'আপনিও কি কিছু কম ব্যক্তিগতভাবে বলছেন, সেনর? যে লোকটাকে আপনি গাধার পিঠে চড়ে দেখেছিলেন, যাকে দেখে আপনার মনে হয়েছিলো আমাদের মানবত্রাতা যিশুর মতো, কিন্তু খৃষ্টধর্ম-বিশ্বাসী কোনো মানুষের কাছে কি সত্যিই কখনও তা মনে হতে পারতো? আর হলেও, তা তিনি যত অধার্মিকই হোন, কোনো যাজকের কাছে এসব কথা বলার আগে তিনি নিশ্চয়ই আর একবার ভেবে দেখতেন। এর পরেও আমি যদি প্রশ্ন করি আপনি ইশ্বরে বিশ্বাস করেন কি না, আপনি কি মনে করবেন আমি আপনাকে কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি? না, সত্যি বলতে কি, ওষুধের চাইতে মেক্সিকানদের যা প্রয়োজন তা হলো বিশ্বাস।'

'তার মানে, অন্যভাবে বলতে গেলে,' ভেতরের চাপা বিরক্তিকে এতটুকু গোপন করার চেষ্টা না করেই আমি বললাম, 'ওই লোকটার

কাহিনী আপনাকে এতটুকু বিচলিত করেনি এবং ওকে সাহায্য করার আপনার কোনো ইচ্ছেই নেই।'

'বরং ঠিক তার বিপরীত। লোকটা সত্যিই আমাকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে, এবং ওর জন্যে আমি নিশ্চয়ই কিছু করবো—অন্তত আমার বিশ্বাস আপনার চাইতে হয়তো একটু বেশিই করতে পারবো।'

'সেটা কি ভাবে একটু জানতে পারি কি?'

'আমি ওর জন্যে প্রার্থনা করবো।' কথাটা বলে, হাত দুটোকে বুকের কাছে ভাঁজ করে আবার আগেরই মতো নিঃশব্দ পায়ে উনি ফিরে গেলেন।

বরাবর ডাক্তার সেরেস্তের বাড়িতে রাতের খাওয়া মানেই একটা বিশেষ কিছু। শুধু যে তার স্পেনীয় স্ত্রী রীতিমতো আকর্ষণীয়া বা অতিথিপরায়ণা, কিংবা যারাই এখানে আসে তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো গুণের অধিকারী এবং প্রায়ই কৌতূহল জাগায়, তাই-ই নয়—খাবার-দাবারও সত্যিকারের রুচিসম্মত, বিশেষ করে মেক্সিকান খাবার পৃথিবীর অন্যান্য যে কোনো দেশের চাইতে ভালো।

সেরেস্তদের বাড়িটা অবশ্য প্রাচীন মেক্সিকান রীতিতে তৈরি। বৈচিত্র্যহীন শোবার সবকটা ঘরই এক সারিতে, রাস্তার মুখোমুখি, যার অধিকাংশ জানলা প্রায়ই বন্ধ থাকে। খিলানওয়ালা একটা গাড়ি-বারান্দার মধ্যে দিয়ে বাড়িতে ঢোকার প্রবেশ পথ। কিন্তু ভেতরে ঢোকার পর মনে হবে এ যেন কোন্ স্বপ্নপুরী। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা চতুষ্কোণ বাড়ির ঠিক মাঝখানে চমৎকার একটা বাগান। প্রত্যিটা শোবার ঘরের সামনে দিয়ে চলে গেছে একটা টানা বারান্দা। সারাক্ষণ বাগানের মুখোমুখি ওই বারান্দার ওপরেই সেরেস্তদের খাওয়া বসা আর যা কিছু গল্প-গুজব করা। মেক্সিকোর অধিকাংশ বাগানের মতো সেরেস্তদের বাগানটাও যে খুব একটা বড় তা কিন্তু নয়, তবে সবচেয়ে যা ভালো লাগে তা হলো নানা ধরনের গাছগাছালি, লতাগুল্ম আর গ্রীষ্ম-

প্রধান দেশের মতো আশ্চর্য মসৃণ গাঢ় সবুজ রঙের ঘাস। বিদায় গোধূলিবেলায়, সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে আমরা যেন কোন্ যাদুর দেশে রয়েছি—কেবল মাঝে মাঝে ডাক্তারের বছর দশেক বয়েসের ছেলেটা আর তার খেলার সাথীদের উল্লাসধ্বনিই আমাদের এই বাস্তব পৃথিবীর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

আমার স্ত্রী আর আমি যখন পৌঁছলাম, শ্রমিক নেতাটি তার আগেই এসে পৌঁছেছে। ত্রিশের কাছাকাছি বয়েস, রীতিমতো বলিষ্ঠ গড়ন, চওড়া কাঁধ, উষ্ণ আর ভরাট মুখ। কয়েক মিনিট পরেই নির্বাসিত সেই ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী এসে পৌঁছলেন। ভদ্রমহিলা রোগা, ছিপছিপে চেহারা, ভারি সুন্দর কালো ক্লান্ত দুটো চোখ, দেখলেই মনে হয় অসম্ভব নিঃসঙ্গ। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন আর এক ভদ্রলোক—চিলিয়ান সেনেটের সভ্য এবং মেক্সিকো শহরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের চিলিয়ান শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি। সবার সঙ্গে পরিচিত হবার পর আমরা গোল হয়ে বসলাম, পান করলাম ডাক্তার সেরেস্তের নিজের হাতে পরিবেশন করা চমৎকার মদ। তার সঙ্গে শুরু হলো আধা স্প্যানিশ, আধা ইংরাজীতে নানান বিষয়ে আলাপ-আলোচনা। চড়া সুরের ইংরাজী ভাষার জড়তাকে অতিক্রম করে প্রবাহিত হয়ে চললো গুঞ্জরিত স্প্যানিশের শ্রুতি-মাধুরিমা, এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় অনায়াস পরিক্রমা।

গৃহযুদ্ধের সময় চিলিয়ান ভদ্রলোক স্পেনে ছিলেন। ওই সময়েই সেরেস্তের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ভদ্রমহিলা তখন নার্স ছিলেন। তাঁদের পুরনো স্মৃতি বারবার ঘুরে ফিরে স্পেনে রক্তক্ষয়ী সেই দিনগুলোর নির্যাতন, পরাজয় আর নির্বাসনের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। মেক্সিকান শ্রমিক নেতার নাম দিয়েগো গোমেজ। গৃহযুদ্ধের সময় তার বয়স এত অল্প ছিলো যে সেসব দিনের কথা আজ আর সে স্পষ্ট করে স্মরণ করতে পারে না। সেরেস্তের সঙ্গে সে বরাবরই স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলছে এবং সেইসব দিনগুলোর বীরত্বব্যঞ্জক অথচ করুণ কাহিনী তাকে কেবলই

বিষণ্ণ করে তুলেছে। সম্ভবত প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যেই সেরেন্স তাকে সেই ঘটনাটা বললো—কেমন করে সেদিন দউইট দ. মরো সরণিতে যিশুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো। আমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্যেই সেরেন্স বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কথাটা বলেছিলো, নির্বাসিত ভদ্রলোকও তাকে সমর্থন করে বললেন, 'এ গল্পের নামকরণ করা উচিত দউইট দ. মরো সরণিতে যিশু। সত্যি, এ পৃথিবীতে এর চাইতে উদ্ভট আর কি হতে পারে বলুন?'

'আমারও সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে!' ঝরনার কলতানের মতো আশ্চর্য মিষ্টি গলায় শ্রীমতী সেরেন্স বলে উঠলেন।

'শুধু দউইট দ. মরো নয়,' গোমেজ প্রস্তাব দিলো, 'এ কাহিনীর সব চাইতে ভালো নামকরণ হবে—কুয়েরনাভাকায় যিশু। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যিশু যদি সত্যিই কখনও ফিরে আসেন, তাহলে এ পৃথিবীতে কুয়েরনাভাকাই হবে শেষ জায়গা যেখানে তিনি অতি অবশ্যই পরিভ্রমণ করতেন।

'কেন?'

'এটা কি হতে বাধ্য নয়?' গোমেজ বিস্ময় প্রকাশ করলো। 'মেক্সিকোর দুঃখই তাঁকে এখানে টেনে আনতো। আমার দেশের মানুষ, আচার-আচরণে যার অত্যন্ত সাধারণ, আবেগদীপ্ত গলায় নিদারুণ যন্ত্রণার কথা তারা তাঁকে বুঝিয়ে বলতো, অন্তত এ কথা উল্লেখ করতে পারতো—ঈশ্বরের কাছ থেকে উত্তর আমেরিকা যতটা কাছে, মেক্সিকো ঠিক ততটাই দূরে। অথচ কুয়েরনাভাকায় উত্তর আমেরিকা আজ আমাদের পিঠের ওপর ভারি বোঝার মতো চেপে বসে রয়েছে। ওরা আমাদের অত্যন্ত সাধারণ ধরনের মেক্সিকান পানশালাগুলো দামী দামী মদে ভরিয়ে দিয়েছে, নাচঘরগুলোয় ওদের সমকামী পুরুষদের ভিড় উপচে উঠছে, আমাদের সুন্দর সুন্দর উদ্যান আর সরণিতে ওদের শীর্ণ, লোলুপ, ক্লীব মেয়েগুলোই ঘুরে বেড়ায়, আমাদের পাহাড়গুলোর ভাঁজে ভাঁজে

ওরা বিশাল বিশাল সব প্রাসাদ তুলেছে, ওদের বিপুল ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে ধাঁধিয়ে দিয়েছে আমাদের চোখ। শুনলে অবাক হয়ে যাবেন—আমার শালীর এক খুড়তুতো বোন, নিতান্তই সাদামাঠা একজন চাষীর ঘরের বউ, এখানে টম্পসনদের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। টম্পসন এক সময়ে ছিলেন আর্জেন্টিনায় আমেরিকান রাষ্ট্রদূত। মেয়েটি মাইনে পায় মাসে দেড়শো পেসো। সপ্তায় সাতদিনই তাকে কাজ করতে হয়। গত সপ্তায় টেকসাসের এক তেল ব্যবসায়ী টম্পসনদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। ভদ্রলোক নেশায় একেবারে চুর হয়ে টম্পসনের স্ত্রীকে প্রেম নিবেদন করছিলেন। নিজের মহত্বকে জাহির করার জন্যে কুড়ি ডলারের নোট পাকিয়ে উনি টম্পসনের স্ত্রীর সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছিলেন। ভদ্রমহিলা যতবারই সিগারেট চাইছিলেন, উনি ততবারই কুড়ি ডলারের নোট পাকিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছিলেন। চারবারও যদি হয়, তাহলে ধরুন এক হাজার পেসো। অথচ গত বছরই ওই ঝিটির ছোট বাচ্ছাটা মারা গিয়েছিলো মাত্র আড়াইশো মিলিগ্রাম টেরামাইসিনের অভাবে, যার দাম হয়তো দুপেসো…'

'হ্যাঁ, আমি জানি, এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে,' আমার স্ত্রীই বলে উঠলো। 'তা বলে আমরা সবাই কিন্তু ও রকম নই। একা টম্পসনকে দিয়ে আপনি এক কোটি ষাট লক্ষ লোককে বিচার করতে পারেন না।'

'বিচার করার আমি কেউ না,' গোমেজ হাসতে হাসতেই জবাব দিলো। 'কুয়েরনাভাকায় যিশুর পরিভ্রমণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই কথাগুলো এসে পড়লো।'

'আসলে মুশকিল কি হয়েছে জানেন,' নির্বাসিত ভদ্রলোক এই প্রথম আলোচনায় অংশ নিয়ে মন্তব্য করলেন, 'উত্তর আমেরিকানরা এখনও পর্যন্ত মেক্সিকোকে বোঝার চেষ্টা করতেই শুরু করেনি।'

'অবশ্য আপনাদের মতো কয়েকজন মানুষকে বাদ দিয়ে,' ডাক্তার আন্তরিক ভাবেই শুধরে দিলেন।

'সম্ভবত।' নির্বাসিত ভদ্রলোক সসংকোচেই স্বীকার করলেন।

'কেননা আংশিক হলেও অন্তত আমার ধারণা—আমি মেক্সিকোকে বুঝতে পারি।'

'কিন্তু আমি পারি না,' চিলিয়ান ভদ্রলোক নির্দ্বিধায় বললেন। 'এবং কোনোদিনও পারবো না। এমন কি আমি ঠিক করেছি, বোঝার আর চেষ্টাও করবো না। গত তিন সপ্তাহ আমি এখানে রয়েছি, কিন্তু মনে মনে ভেবে দেখলাম মেক্সিকোকে বোঝার চেষ্টা করার চাইতে তাকে ভালোবাসা অনেক সহজ।'

'কিন্তু আমাদের বোঝাও খুব সহজ,' ব্যাথাতুর গলায় গোমেজ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো। 'আমরা সরল মানুষ, আর খুব গরীব। হয় স্প্যানিয়ার্ড, নয়তো উত্তর আমেরিকানদের বোঝা বইতে বইতে আমাদের পিঠ বেঁকে গ্যাছে। আমাদের বুঝতে পারাটা কঠিন—সবাই কেন যে এই একই অভিযোগ করেন আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না?'

'আর যেদিন পিঠ বাঁকা থাকবে না?'

'সেদিন মেক্সিকোকে আবার দেখতে পাবেন—ঠিক এখন যেমন বাগানটাকে দেখতে পাচ্ছেন, ওই রকম।'

'আমরা কিন্তু সবাই সেই অসুস্থ মেয়েটার কথা ভুলে গেছি,' আমার স্ত্রীই স্মরণ করিয়ে দিলো, 'ওর কি হবে?'

'কি আবার হবে, মরবে।' গোমেজের কণ্ঠস্বরে কোথাও কোনো জড়তা নেই।

'আর আমরা সেটা মেনে নেবো

'না নিয়ে আর উপায় কি?'

'লোকে কেন যে ছুটি কাটাতে মেক্সিকোয় আসে, আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না!' ঠাট্টার ছলেই সেরেস্ত মন্তব্য করলো।

'কেন, আমাদের নদী, পাহাড়, মাঠ আর গির্জা দেখতে।' হাসতে হাসতেই গোমেজ জবাব দিলো।

হঠাৎ মনে পড়ায়, এখানে আসার আগে গির্জার যাজকের দেখা হওয়ার ঘটনাটা আমি ওদের বললাম।

'তোমার সেই বিখ্যাত স্প্যানিশ ভাষাতে তো?' সেরেন্ত আবার আমাকে খোঁচা দিলো।

'না না, উনি খুব ভালোই ইংরাজী বলেন। গৃহযুদ্ধের সময় উনি স্পেনে ছিলেন, সেখানেই উনি ইংরাজী শিখেছেন।'

'গৃহযুদ্ধের সময় উনি আবার স্পেনে কি করতে গিয়েছিলেন?'

'সে সময় উনি মেক্সিকোয় অস্বস্তি বোধ করছিলেন। আমি অবশ্য আর জিগেস করিনি উনি স্পেনে কি করতে গিয়েছিলেন। তবে অনুমান করে নেওয়াটা খুব একটা কঠিন নয়।'

'উনি তোমার সব কথা মন দিয়ে শুনলেন?'

'হ্যাঁ, খুব মন দিয়ে শুনলেন।'

'তারপর কি বললেন?'

'বললেন ছোট মেয়েটার বাঁচা-মরা সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ওপরেই নির্ভর করছে। আমার অহেতুক নাক গলাতে যাওয়ায় উনি রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়েছেন।'

'আমার একবার একটা ঘটনা মনে পড়ছে,' ঠোঁটে ম্লান একটুকরো হাসি ফুটিয়ে তুলে নির্বাসিত ভদ্রলোক বললেন। 'অনেক বছর আগে আমি একবার ভারতবর্ষে গিয়েছিলাম, তখন সেটা ছিলো একটা ব্রিটিশ উপনিবেশ। বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক সংগঠকদের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে ছিলাম। তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে প্রশ্ন করায় একজন আমাকে বললেন—যেহেতু কর্মসূচী দীর্ঘ এবং ব্যাখ্যা করে বোঝাতে গেলে অনেক সময় লাগবে, তাই সংক্ষেপে উনি শুধু একটা কথাই বলতে পারেন : আমার দেশের সমস্ত মানুষকে যদি এক সঙ্গে থুতু ফেলতে শেখানো যায়, তাহলে তাতে যা ঢেউ উঠবে, সেই ঢেউই প্রতিটা ইংরেজীকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারবে সমুদ্রে।'

'কথাটা শুনতে খুব সহজ হলেও,' বিদ্রূপ বাঁকানো স্বরে গোমেজ বললো, 'সবাইকে একসঙ্গে শেখাতে গেলে কখনও কখনও কয়েক শতাব্দীও লেগে যেতে পারে।'

'গোমেজ, তুমি কিন্তু ও রকম ভাবে হাসবে না,' সেরেন্তের স্ত্রী ধমক দিলেন, 'খুব বিশ্রী দেখায়।'

'একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না,' চিলিয়ান ভদ্রলোক আমাকে জিগেস করলেন, 'গাধায় চড়ে যাওয়া লোকটাকে আপনার যিশুর মতো মনে হলো কেন? আপনি তো যিশুকে কখনও ছ্যাখেননি?'

ওনার প্রশ্নের মধ্যে ব্যবহৃত স্প্যানিশ ইডিয়মটা যে আমাকে দ্বিধায় ফেলেছে, সেটা বুঝতে পেরেই সেরেন্ত তর্জমা করে দিলো।

আমি বললাম, 'না, তা দেখিনি। তবে যিশুর অজস্র ছবি বা ভাস্কর্যের সঙ্গে লোকটার মুখের আশ্চর্য একটা মিল আছে।'

'আমার ভাবতে অবাক লাগছে,' অনেকটা যেন স্বগত স্বরেই চিলিয়ান ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন, 'যিশু সত্যিকারের কোনোকালে ছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে যথেষ্ট দ্বিধা থাকা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীতে তাঁর অজস্র ছবি আর অগণন প্রতিমূর্তি রয়েছে। এক একজন এক এক রকম ভাবে তাঁকে রূপ দিয়েছেন। রেমব্রাণ্ট তাঁর মুখটাকে এঁকেছেন ইহুদিদের মতো করে। স্প্যানিয়ার্ডরা যখন আমাদের দেশে এসেছিলো যিশুকে তারা রূপ দিয়েছিলো স্প্যানিশ মুখের আদলে। পরে অবশ্য আমাদের শিল্পী আর ভাস্কররা একটু একটু করে তাকে রূপান্তরিত করেছে চিলিয়ান মুখে—বেদনাক্লিষ্ট, ক্লান্ত, শান্ত, চিলির কোনো খনি-শ্রমিক বা চাষীদের মুখের মতো করে। সুতরাং এক একটা দেশে, এক একটা যুগের ধারায় পরিবর্তিত হয়েছে যিশুর মুখ, এমন কি তাঁর সমস্ত অবয়ব। তাই আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কেমন করে আপনি এত সুনিশ্চিতভাবে ধরেই নিলেন যে লোকটাকে ঠিক যিশুর মতো দেখতে?'

'আমিও তাই,' সেরেন্ত ওঁকেই সমর্থন করলেন। 'লোকটা আমারই রুগী, অথচ আমার একবারও ও কথা মনে হয়নি।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছো, উনি একজন সাহিত্যিক।' সেরেন্তের স্ত্রী হাসতে হাসতে বললেন। 'ওঁর জীবনে যেসব ঘটনা ঘটে বা মনে হয়,

তোমার জীবনে কখনও তা ঘটবে না। কিন্তু এর পরেও আমরা যদি অপেক্ষা করি, তাহলে রাতের খাওয়াটা সত্যি সত্যিই মাটি হয়ে যাবে।'

শুধু রাতের খাওয়া বললে হয়তো একটু ভুলই হবে, চমৎকার আর সুস্বাদু সব খাবারে রীতিমতো এক ভুরি ভোজ। গরম তন্দুরি রুটি, তার ওপর ছড়ানো টুকরো টুকরো বাছুরের মাংস, কোকো দিয়ে তৈরি চাটনি, ফ্রিজোল, ঘরে তৈরি অ্যারোজ, মুরগীর মাংসের টুকরো আর বাগদা চিংড়ি দেওয়া ভারি সুন্দর মেক্সিকান চালের বিরিয়ানি, পিঁয়াজ আর রশুনে জরানো ক্যালাভো, টাটকা শসা আর টমেটোর স্যালাড, তার সঙ্গে ঠাণ্ডা মেক্সিকান বিয়ার, যা পৃথিবীর যে কোনো দেশের বিয়ারের চাইতে ভালো।

খাবার সময় আলোচনার ধারা অন্য খাতে মোড় নেওয়ায় আমার স্ত্রী আর আমি স্বস্তি বোধ করলাম। নানান বিষয়েই আলোচনা হলো—মেক্সিকান শিল্প, চিলিতে সুসংগঠিত দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম, মেক্সিকান আর স্প্যানিশ নাচের পার্থক্য, মেক্সিকোয় স্প্যানিয়ার্ডদের সংখ্যা এত বেশি কেন, মেক্সিকো শহর আর কুয়েরনাভাকার মধ্যবর্তী যে সুন্দর জাতীয় সড়কটা শ্রমিকরা গড়ে তুলেছে, তাদের দৈনিক মজুরি মাত্র ছপেসো, জাতীয় সড়কের মেক্সিকান প্রান্তে শ্রমিকদের যে অনিন্দ্য সুন্দর প্রতিমূর্তিটা গড়ে তোলা হয়েছে, সেটা এক ধরনের নির্মম বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়—অবশ্য এ প্রসঙ্গে গোমেজ প্রতিবাদ না করে পারলো না যে চরম দারিদ্র্য সত্ত্বেও যে নতুন জনগণ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, জন্ম হচ্ছে আগামী দিনের ঈশ্বরের, ওই প্রতিমূর্তিটা সেই শ্রমিকশ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করছে। নির্বাসিত ভদ্রলোক বললেন—দিয়েগো রিভেরা পরিকল্পিত মোজেইকের কারুকার্য করা ইউনির্ভাসিটি শহরটা সত্যিই ভারি চমৎকার। চিলিয়ান ভদ্রলোক জানতে চাইলেন—ছাত্ররা যাতে বাস-ভাড়ার অভাবে সেখানে পৌঁছতে না পারে, সেই জন্যেই কি বিশ্ববিদ্যালয়টাকে মূল শহর থেকে অত দূরে বসানো হয়েছে? গোমেজ স্বীকার করে নিলো—মেক্সিকোয় দরিদ্রতম ছাত্রদের জন্যে এমন চমৎকার

একটা বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও চিলিয়ান ভদ্রলোকের অভিযোগ মিথ্যে নয়। তারপর স্বাভাবিক ভাবেই আলোচনার ধারা মোড় নিলো অতি সম্প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা আর নির্মম নির্যাতনে যাকে প্রায় বিধ্বস্ত করে ফেলা হয়েছে, সেই গুয়াতেমালার দিকে। অথচ এমনই দুর্ভাগ্যজনক, প্রচণ্ড ক্রোধ আর ঘৃণায় মেক্সিকোর যখন ফেটে পড়া উচিত ছিলো, তখন গুয়াতেমালার জন্যে দু-এক কোঁটা অশ্রু ছাড়া আর সে কিছুই ঝরাতে পারেনি।

এমন ভাবে মানুষের উষ্ণ সান্নিধ্য আর আলাপ আলোচনায় মনোরম সন্ধ্যেটা কেটে গেলো, মিশে একাকার হয়ে গেলো স্মৃতি আর আশা। শুধু কথা বা অনুমান নয়, এঁরা প্রায় সবাই-ই সেই ধরনের মানুষ, মনেপ্রাণে যা বিশ্বাস করেন বাস্তবে আন্তরিক ভাবেই তাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেন—জীবনের লাভ লোকসান সম্পর্কে এরা সত্যিই সচেতন।

অবশেষে এমন একটা সময় এলো যখন আমাদের অবশ্যই ফেরা উচিত। মাঝ আকাশে চাঁদটা জ্বলজ্বল করছে। সন্ধ্যেবেলায় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় আকাশ একেবারে ঝকঝকে আর পরিষ্কার। আমরা পরস্পরকে বিদায় জানাতে শুরু করলাম। ডাক্তার সেরেন্ত প্রস্তাব করলো গাড়িতে করে আমাদের বাড়ি পৌঁছে দেবে, কিন্তু গোমেজ যে আমাদের হোটেলেরই কাছে সম্প্রতি তার কাকার বাড়িতে উঠেছে, জানালো এমন সুন্দর চাঁদনি রাতে সে হেঁটেই বাড়ি ফিরবে। তখন আমরা ঠিক করলাম এক সঙ্গে হেঁটে ফিরবো।

আলোবিহীন জ্যোৎস্না ধোয়া পথে হাঁটতে হাঁটতে আমরা বিশেষ কিছুই আলোচনা করিনি। কেননা সদ্য সমাপ্ত একটা দারুণ নৈশভোজের পর মতুন করে আমাদের আর কিছুই বলার ছিলো না, তাছাড়া নীরবতার মধ্যেই আমরা কেমন যেন একটা প্রশান্তি অনুভব করছিলাম। সংক্ষিপ্ত পথে নির্জন প্লাজা অতিক্রম করে সবে দউইট দ মরো সরাণর দিকে মোড় নিতে যাবো, কিন্তু মোরালেসের শেষ বাড়টার কাছে

পৌঁছাবার আগেই দেখলাম রাস্তার জ্বলন্ত বাতিটার নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা লোক।

'এই, লোকটাকে দ্যাখো!'

ছোট্ট ওই কটা শব্দেই আমার স্ত্রী কি বলতে চাইছে, বুঝতে আমার কোনো অসুবিধে হলো না। লোকটা টেলিফোনের তার সারানোর মিস্ত্রি। রাত্রির নির্জনতায় বাতিস্তম্ভের নিচে কোমরের দুপাশে হাত রেখে, পা ফাঁক করে দাঁড়ানো মূর্তিটা সত্যিই পাথরে-কোঁদা বলিষ্ঠ, অনন্য একটা প্রতিমূর্তিরই মতো মনে হচ্ছে। তার এক কাঁধে গোল করে গোটানো একগোছা তার, অন্য কাঁধে টেরচাভাবে ওপর থেকে এসে পড়েছে একটা মোটা কাছি। লোকটার চামড়ার কোমর বন্ধনীতে গোঁজা রয়েছে যন্ত্রপাতি, পায়ে পর্বত-আরোহীদের মতো ভারি চামড়ার বুট, বুকের কাছে সুতির সার্টের অনেকখানি খোলা। গভীর রাতে নীরবে কাজ করে যাওয়া এক বিশ্বস্ত শ্রমিক।

নিঃশব্দ হাসিতে চিনতে পারার ভঙ্গিতে লোকটা আমাদের সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানালো। শান্ত স্থির গাম্ভীর্যকে বজায় রেখে একই শোভন ভঙ্গিতে গামেজ ফিরিয়ে দিলো তার প্রত্যাভিবাদন। মোড়ের মাথায় গোমেজকে বিদায় জানিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম।

দু একদিন পরে, ব্যাপারটাকে অত সহজে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় ভেবেই আমার স্ত্রী ডাক্তার সেরেন্তর সঙ্গে দেখা করলো, তাকে মিনতি করলো যাতে ছোট মেয়েটির অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা যায় এবং এর জন্যে যে টাকা লাগবে সে যেন আমাদের কাছ থেকে নেয়। কিন্তু আমার বেলায় সে যেমন করেছিলো, আমার স্ত্রীর ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি ভাবে বোঝাতে সক্ষম হলো যে সেটা সম্ভব নয়। এমন কি সে নিজেও জানে না ওরা কোথায় থাকে, কি ওদের ঠিকানা। সে শুধু এইটুকু জানে পাহাড়ের গায়ে কোথায় যেন ওদের সামান্য কয়েক বিঘে জমি আছে। যতক্ষণ না আবার ওরা নিজে থেকে তার ডাক্তারখানা এসে দেখা করছে,

ততক্ষণ পর্যন্ত ওদের সঙ্গে কোনো মতেই যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া অস্ত্রোপচার করলেই যে মেয়েটি সেরে উঠবে, তেমন মনে করার যথেষ্ট কোনো কারণ নেই। 'আপনারা স্বেচ্ছায় ওদের টাকা সাহায্য করতে চাইছেন কেন?' ডাক্তার সেরেন্ত আন্তরিকভাবেই স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করলো। 'যেহেতু আপনাদের মনটা সত্যিকারের খুব ভালো আর নরম। কিন্তু আপনারা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না এই ধরনের দানের প্রকৃত অর্থ কি—এ অনেকটা হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষের মুখের সামনে রুটির ছোট্ট একটা টুকরো তুলে ধরার মতো। আপনি হয়তো ভাবছেন আমি নিষ্ঠুর, তবু না বলে পারছি না—এই ধরনের পরোপকারিতার অন্য অর্থ প্রচণ্ড ক্রোধের ওপর সামান্য একটু জল ঢালা। ক্রোধ—ভয়ঙ্কর ক্রোধ ছাড়া এ দেশটার আর কোথাও কোনো আশা নেই।'

এই ব্যর্থতা আমাদের মানসিকতায় নিঃসন্দেহে একটা গভীর ছায়া ফেলেছিলো। মেক্সিকোয়, যেখানে ডলারের মহান ঈশ্বরও বিকিয়ে যায় সাড়ে বারো পেসোয়, সেখানে দরিদ্রতম কোনো আমেরিকান ভ্রমণকারীও হেলায় অতিক্রম করে যেতে পারে জাঁকজমকদীপ্ত প্রবঞ্চনাকে—যদি সে কখনও একবার নিজের দিকে ফিরে তাকায়। অবশ্য একথা সত্যি, সবাই নিজের দিকে ফিরে তাকায় না—কিন্তু তবু, কেউ কখনও, অন্তত একটা মুহূর্তের জন্যেও তো নিজের সত্তার গহন গভীরে দৃষ্টি ফেরাতে পারে!

সেরেন্তের সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার আগে প্রায় দিন দশেক কেটে গেছে। ডাক্তারখানায় রুগীর ভিড় উপচে উঠছে। পাহাড়ে কোথায় যেন হঠাৎ বিশ্রী ধরনের আমাশা শুরু হয়েছে, তাই তার ডাক্তারখানায় তিল ধারণেরও জায়গা নেই। গরীব মেক্সিকানরা জানে ডাক্তার সেরেন্ত স্প্যানিয়ার্ড—কিন্তু স্মৃতিশক্তি যাদের গভীর, তারা জানে মেক্সিকানরা স্প্যানিয়ার্ডদের কোনোদিনই তেমন পছন্দ করে না—তবু তারা এটাও

ভালো করে জানে যে ডাক্তার সেরেন্তু কোনোদিনই তাদের ফেরাবে না। অথচ এই মেক্সিকোতে আরও অনেক ডাক্তার রয়েছেন, আগে টাকা না দিলে যাঁরা রোগীর দিকে ফিরেও তাকান না। ফলে সেরেন্তুর ডাক্তারখানায় রুগীদের ভিড় যে উপচে উঠবে সেটাই স্বাভাবিক।

একদিন দুপুরবেলায়, তখন প্রায় দুটো, রুগী দেখার চাপে ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে সেরেন্তু হঠাৎ আমাদের বাসায় এসে হাজির হলো, বললো :

'উফ্, কয়েক ঘণ্টার জন্যে কোথা থেকে ঘুরে আসতে না পারলে সত্যিই পাগলা হয়ে যাবো! এই বিকেলটায় তুমি কি কিছু করছো?'

'অন্যান্য বিকেলগুলোর মতোই বিশ্রাম নেওয়ার কঠিন কাজে ব্যস্ত রয়েছি।'

'তাহলে আমিই বা কেন অন্তত একদিনের জন্যে পর্যটক হতে পারবো না?'

'হতে পারবে না যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে কোনোদিনও তুমি তা চাও না। যাই হোক, ওসব ভণিতা ছেড়ে, কোথায় যেতে চাও তাই বলো?'

'অদ্ভুত একটা জায়গায়। পাহাড়ের একদম চূড়ায় এক্সোক্যালকো নামে একটা প্রাচীন শহর আছে, জায়গাটা সত্যিই ভারি সুন্দর। এখান থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে আসার মতো এমন চমৎকার জায়গা আশেপাশে তুমি আর কোথাও খুঁজে পাবে না। স্ত্রী কি তোমাকে ছাড়বে বলে মনে হয়?'

'ওর জন্যে কোনো অসুবিধে হবে না। আমি শুধু ভাবছি, আমার মতো অসুস্থ লোকের পক্ষে অতখানি পাহাড়ী পথ ভেঙে ওঠাটা কি ঠিক হবে?'

'পাহাড়ের প্রায় সবটা পথই তুমি আমার গাড়িতে যেতে পারবে। ডাক্তার হিসেবে এটুকু তুমি অন্তত আমাকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে পারো যে ওখানকার তাজা বাতাস এবং পারিপার্শ্বিকতা তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে বরং ভালোই হবে।'

ডাক্তারের মন্তব্যে আমার স্ত্রী শুধু রাজি নয়, খুশিও হলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। সমতলভূমির দুপাশের সবুজ ধানের ক্ষেত অতিক্রম করে আমাদের গাড়ি কুয়েরনাভা-কার উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত পর্বত প্রাচীরের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো। বেশ খানিকক্ষণ এগুনোর পর প্রধান সড়ক ছেড়ে একটা পাশ-পথে বাঁক নিলাম। অশ্চর্য সুন্দর চওড়া একটা উপত্যকার বুক চিরে আমরা ছুটে চলেছি। আশেপাশে একফালি চাষের জমি বা একটাও পর্ণকুটির নেই, তৃণভূমির বুকে চরে বেড়াচ্ছে না কোনো গাধা কিংবা দিগন্তরেখার পটভূমিতে চোখে পড়ছে না লাঙল টেনে নিয়ে চলা কোনো বলদের চিহ্ন। কতক্ষণ মগ্ন হয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ চমক ভাঙলো সেরেন্তর নির্দেশে। দূরের আরক্ত একটা ধ্বংসস্তূপ দেখিয়ে সে বললো, 'এই যে, আমরা এসে গেছি।'

দেখলাম চূড়াটা বেশ উঁচু। মনে হলো অত উঁচুতে গাড়ি বোধ হয় উঠতে পারবে না। সম্ভবত আমার আশঙ্কার কথা অনুমান করতে পেরেই ডাক্তার মন্তব্য করলো, 'তুমি যা ভাবছো হয়তো ঠিক, কেননা এর আগে আমি এখানে কখনও আসিনি। তবে পুরনো দিনে মেক্সিকানরা শহর বানিয়েছে অথচ সড়ক বানায়নি, এমন ঘটনা কিন্তু সত্যিই বিরল। অতীত দিনের বহু স্থাপত্য ধুলোয় মিশে গেলেও, তার কিছু কিছু নিদর্শন আজও টিঁকে আছে। এবং পাথরের কাজে মেক্সিকানরা যে কত নিপুণ আর দক্ষ কারিগর, সে তুমি ওদের যেকোনো কাজ দেখলে নিজেই বুঝতে পারবে। শুধু তাই নয়, ওদের বেঁটের ওপর বলিষ্ঠ ধরনের পুরাতত্ত্বের নিদর্শনগুলো সারা ইউরোপে আজও সমাদৃত। এর জন্যে ওরা নিজেরাও গর্ব বোধ করে। অবশ্য এর অন্যতম কারণ, মেক্সিকানরা আজও তাদের অতীতকে ভুলে যায়নি।'

'কিন্তু অন্যেরা ভুলে গ্যাছে।'

'হ্যাঁ, এক রকম বলতে গেলে তাই-ই।'

চালক হিসেবে সেরেন্ত যে এত নিপুণ আমার জানা ছিলো না। একদিকে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে পাথরের নিচু পাঁচিল দেওয়া খুবই

সংকীর্ণ পথে ঘুরে ঘুরে আমরা কেবল উঠছি তো উঠছিই—অন্তহীন এই সব বাঁক বুঝি আর কোনোদিনও ফুরবে না। আমাদের মাথার ওপরে শঙ্খিল পথ, নিচে ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে বিস্তীর্ণ উপত্যকা। শেষ পর্যন্ত আমরা এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম, যেখানে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া আর আদৌ সম্ভব নয়। গাড়িটাকে একপাশে দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। তবে চূড়াটা বেশি দূরে নয়, চার পাঁচশো গজের মধ্যেই।

যদিও সেরেস্তর বর্ণনা থেকে অনুমান করেছিলাম জায়গাটা নিঃসন্দেহে নতুনত্বের দাবী রাখবে, তবু উত্তরে বা মেক্সিকো শহরের আশেপাশে দেখা ধ্বংসস্তূপ থেকে জায়গাটার মুটামুটি একটা চিত্রকল্প আগে থেকেই আমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গিয়েছিলো। যদিও এইসব ধ্বংসস্তূপ প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে এক লোভনীয় নিদর্শন, তবু এই জায়গাটা এখনও প্রায় ছোঁয়া হয়নি বললেই চলে। কেবল একটি মাত্র পিরামিড ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে তোলা হয়েছে। পিরামিডটার বিশালতায়, তার নিপুণ ভাস্কর্যে আমার শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসার জোগাড়। নির্বাক, বিহ্বল-বিস্ময়ে আমি অতীতের সেই ভয়ংকর দিনগুলোর কথাই ভাবছিলাম।

আমরা কচ্ছপের পিঠের মতো ঢালু অধিত্যকার ওপর এসে দাঁড়ালাম। সামনে পেছনে প্রায় দেড় মাইল বৃত্ত ঘিরে এই অধিত্যকাতেই গড়ে উঠেছিলো মৃত পাথরের বিশাল শহরটা—যার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে কোথাও উঁকি দিচ্ছে একটা দেওয়াল, ঘরের কোনো তাক্, দরজা-জানালার শূন্য গহ্বর কিংবা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব থাম, যার কেবল নিচের অংশগুলোই তখনও অবশিষ্ট রয়েছে। এককালে যেখানে বাগান ছিলো, হয়তো ঝলমলে রঙিন পোশাক পরে লোকজনরাই সেখানে যাতায়াত করতো, যেখানে ঝরনা ছিলো, উজ্জ্বল মেক্সিকান সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিতো সাত রঙের বর্ণালী। নির্জন শূন্যতার মধ্যে দিয়ে অনধিকার প্রবেশকারীর মতো আমরা হেঁটে গেলাম, একমাত্র

যে পিরামিডটা খুঁড়ে বার করা হয়েছে সেটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলাম। আমার দেখা অন্য সব পিরামিডের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই—এর দুর্লভ, অনন্য কারুকার্যের সঙ্গে অন্য কারুর তুলনাই হয় না। এই শহরটায় কোন্ ধরনের লোক বাস করতো সে সম্পর্কে সেরেন্ত কিছু জানে কিনা জিগেস করলাম। সে বললো :

'এ সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি। তবে যে নামেই তাদের অভিহিত করা হোক না কেন, আজও এই পাহাড়ের আশেপাশে যেসব চাষী বাস করছে, ওরা ছিলো ঠিক সেই ধরনেরই লোক। মাটির শৃঙ্খলে বাঁধা যে মানুষ তারা সাধারণত কখনও পালায় না। সবকিছুকে সহ্য করেই তারা টিঁকে থাকে, সবকিছুকে টিঁকিয়ে রাখারও চেষ্টা করে…'

সত্যিই কি তাই! আমি অবাক হয়ে ভাবলাম। সেরেন্ত বললো, 'অনুমান করা হয়, এক্সোক্যালকো নামে পাহাড়ী চূড়ার এই শহরটায় এক সময়ে দশ হাজার লোক বাস করতো। ওই দশ হাজার লোককে খাবার যোগাবার জন্যে কত হাজার লোক যে উপত্যকার নিচে বাস করতো, তার হিসেব কিন্তু আজও করা হয়নি।'

'কিন্তু উপত্যকাটা তো দেখছি নির্জন আর জনবসতিহীন?' আমি জিগেস করলাম।

'না, একেবারে জনবসতিহীন নয়। আশেপাশে এখনও কিছু লোক বাস করে। ওরা সেই দুর্বিসহ যন্ত্রণার স্মৃতি হয়ে আজও টিঁকে আছে। নিজের চোখে দেখেছি স্পেনের দুঃসহ যন্ত্রণা—আমি নিজে যার একটা অংশ, কিন্তু মেক্সিকোর যন্ত্রণা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এ পৃথিবীতে যা কিছু দানবীয়, যা কিছু ভয়ঙ্কর কুৎসিত, মেক্সিকোকে বহুবার রক্তাক্ত করেছে, নির্যাতন করেছে নির্মমভাবে। গির্জা আর উত্তর আমেরিকা তাকে বহুবার শিক্ষা দিয়েছে, আজও দিচ্ছে। এমন কি নিজের দেশের ধনীরাও শিরার অর্ধেক রক্ত শুষে মেক্সিকোকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এমনিভাবে চলে আসছে চারশো বছর ধরে। অন্য কোনো জাত হলে

কি এমন বলিষ্ঠ, এমন গর্বিত, এমন দুঃসাহসীর মতো বেঁচে থাকা সম্ভব হতো? হয়তো এক সময় এই উপত্যকার নিচে হাজার হাজার মানুষ বাস করতো, হয়তো আবার একদিন হাজার হাজার মানুষই বাস করবে। যারা আজও চলে যায়নি, যারা এখানে বাস করছে, তাদের উত্তর-পুরুষরাই হয়তো একদিন এই উপত্যকাকে ফসলে, ফুলে-ফলে সমৃদ্ধশালী, শ্যামলী করে তুলবে।'

অধিত্যকার ঢাল বেয়ে আমরা এগিয়ে চললাম উন্মুক্ত প্রাঙ্গণটার দিকে, যার স্মৃতিচিহ্ন দেখে মনে হলো উৎসব বা আচার-অনুষ্ঠানে একদিন এই অঙ্গন জনসমাগমে মুখর হয়ে উঠতো। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী রাজ-পরিবারের পুরুষ আর বীর সৈনিকরা উজ্জ্বল রঙিন পোশাকে বসে থাকতো একপাশে, দেওয়ালে চিত্রিত করা থাকতো নানান দেবদেবী আর নিশান, হয়তো বা স্বর্ণখচিত নানান কারুকার্য। কৃষ্ণাঙ্গ একটি রাখাল বালক পায়ে পায়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। ভগ্ন-স্তূপের ফাঁকে ফাঁকে চরে বেড়াচ্ছে তার ছাগলগুলো।

মিষ্টি হেসে ছেলেটি বললো, 'সেনররা যদি চান, পুরোহিতরা কোথায় বাস করতেন আপনাদের দেখাতে পারি।'

আমরা রাজি হলাম। ছেলেটিকে একটা পেসো দিতেই তার কালো মুখখানা প্রসন্ন হয়ে উঠলো। তখন সে আর তার এক পাল ছাগল ঘুর-পথে আমাদের প্রশস্ত একটা আঙ্গিনায় নিয়ে এলো, যেখানে পরপর একসারি ঘর আংশিকভাবে খুঁড়ে তোলা হয়েছে। ছেলেটি সাহায্য না করলে পাহাড়ের চূড়া থেকে এগুলোর কোনো চিহ্নই আমাদের চোখে পড়তো না।

সরেন্ত ছেলেটিকে জিগেস করলো, 'এগুলো যে পুরোহিতের ঘর তুমি জানলে কেমন করে?'

ছেলেটি খুশিতে চলকে উঠলো, হাসতে হাসতে বললে, 'আমি জানি; মেক্সিকো শহর থেকে যারা এখানে খোঁড়াখুঁড়ি করতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড়, সেই তত্ত্বাবধায়কই আমাকে বলেছেন। আমি

প্রায় সারাক্ষণই ওঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতুম, উনি আমাকে সব বুঝিয়ে দিতেন। উনি নিজে মুখে আমাকে বলেছেন—এসবই আমাদের পূর্ব-পুরুষদের তৈরি। হয়তো এমন একদিন আসবে, যখন আমরা আবার এগুলোকে নতুন করে তৈরি করবো। বড় হলে আমিও একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরাতত্ত্ব নিয়ে পড়বো। দূরে, পাহাড়ের ধারে ওই যে নিচু জায়গাটা দেখছেন,' অধিত্যকার প্রায় শেষ প্রান্তে ছুটো পাহাড়ের মাঝখানে সমতল জায়গাটুকু দেখিয়ে সে বললো, 'ওখানে শুধু ঘাস আছে, গাছ নেই। আমি ওঁদের বলেছি ঘাসের নিচে পাথর দিয়ে বাঁধানো চওড়া একটা রাস্তা আছে। ওঁরা বলেছেন আগামী সপ্তাহে ওখানে 'খনন' করবেন। 'খনন' কি আপনারা জানেন তো?'

জানি বলায় ছেলেটির মুখখানা আবার খুশিতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। শুধু পুরোহিতদের ঘর নয়, আরও অনেক কিছু সে আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো আর সারাক্ষণই কিশোরসুলভ চপলতায় বকবক করে চললো। তবে ও সহযোগিতা না করলে আমাদের দেখা হয়তো আদৌ সম্পূর্ণ হতো না।

বিদায় জানাবার সময়, অন্যান্য মেক্সিকানদের মতোই সে যথারীতি সৌজন্য প্রকাশ করলো, যা কোনো মেক্সিকানকেই কখনও শেখাবার প্রয়োজন হয়নি। দীপ্ত হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠা মুখে সে আমাদের বললো, 'আবার আসবেন সেনর, বন্ধুদেরও সঙ্গে নিয়ে আসবেন। কেননা এই পাহাড়ী চূড়ার নিচে কত কি যে আছে অনেকেই জানেন না।'

নিঃশব্দে আমরা গাড়িতে ফিরে এলাম, নিঃশব্দেই এসে পৌঁছলাম পাহাড়ের নিচের চওড়া পথটায়। কেবল উঁচু সড়ক ধরে সবে যখন বাড়ির পথে বাঁক নেবো, সেরেস্তকে জিগেস করলাম:

'ছোট মেয়েটার আর কোনো খবর পেয়েছো?'

'দুদিন আগে ও মারা গ্যাছে।' নিরুদ্বেগ গলায় সেরেস্ত জবাব দিলো। 'যেখানে ওর মৃতদেহটা রাখা হয়েছিলো, গতকাল আমি সেই গির্জায় গিয়েছিলাম। পরে জানতে পেরেছিলাম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে

যা কিছু খরচপাতি সব ডাক্তারই দিয়েছিলো, সেরেন্ত কিন্তু নিজ মুখে সে সম্পর্কে আমাকে কিছু বলেনি। 'মেয়েটাকে সত্যিই ভারি সুন্দর দেখতে! তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না—দুচোখ আমার জলে ভরে উঠছিলো। এখন আমার ভয় হচ্ছে, উত্তর আমেরিকানদের মতো ...অবশ্য কয়েকজনের কথা বাদ দিলে, দিন দিন আমি বোধহয় আরও বেশি ভাবপ্রবণ হয়ে উঠছি। উত্তর-আমেরিকান এবং ভাবপ্রবণতা—দুটোকেই আমি সমান ভাবে ঘৃণা করি...অবশ্য তুমি নিঃসন্দেহে এর ব্যতিক্রম। আশা করি খোলাখুলি স্বীকার করার জন্যে নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ক্ষমা করবে। তাছাড়া মেয়েটিকে যে কোনো মতেই বাঁচানো সম্ভব হতো না একথা জেনে তুমি হয়তো এখন মনে মনে একটু স্বস্তি পাবে।'

'না, আমি একটুও স্বস্তি পাচ্ছি না। আমার ধারণা তুমি সত্যি বলছো না।'

'হয়তো মিথ্যে বলছি। আর বললেই বা কি এসে যায়? সব শিশুরাই সুন্দর—তা সে মেক্সিকো বা উত্তর আমেরিকা যেখানেই হোক না কেন। এখানে শিশুরা মারা যায় আমাশা বা অন্য কোনো সংক্রামক ব্যাধিতে, আর তোমার দেশের শিশুদের জীবন নষ্ট হয়ে যায় অন্যভাবে। এখন তোমাদের নতুন ধরনের এক চমৎকার খেলনা হয়েছে—হাইড্রোজেন বোমা, যা দিয়ে চীন কিংবা রুশ শিশুদের মধ্যে মৃত্যুকে কি অনায়াসেই না ছড়িয়ে দিতে পারো!' ডাক্তার সেরেন্ত গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'অবশ্য আমার মনে হয় এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা না করাই ভালো। যাই হোক, বৃষ্টি আসার আগেই আমাকে আবার ডাক্তারখানায় পৌঁছতে হবে।'

কুয়েরনাভাকায় প্রবেশ করার মুখে দেখলাম আকাশে বেশ মেঘ জমেছে। সেরেন্ত আমাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে, উষ্ণ মুঠোর মধ্যে হাতটা চেপে ধরে অনুরোধ করলো আমি যেন ওর কথায় কিছু মনে না করি এবং ওকে যেন ক্ষমা করি। কিন্তু ও এমন কিছুই বলেনি

যে রাগ বা মনে করতে যাবো, সুতরাং ক্ষমা করার কোনো প্রশ্নই আসে না।

ওপরের তলায় আমাদের বাসায় ফিরে এসে পাহাড়ী চূড়ায় বিকেলটা কাটানোর কথা স্ত্রীকে সব বললাম। ছেলেরা তখনও বাগানে খেলছে। ও প্রস্তাব দিলো এই অবকাশে বাইরের ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা সিগারেট খেতে পারি। তাছাড়া রাতের খাওয়ার আগে নিচের তলার রেস্তোরাঁয় আমাদের কিছু পান করার মতো যথেষ্ট সময়ও হাতে রয়েছে। দিনের এই সময়টাতে, বিশেষ করে বর্ষার সন্ধ্যায় ঝুল-বারান্দাটা আমাদের সত্যিই খুব প্রিয় জায়গা। এখানে দাঁড়ালে বিদায় গোধূলির রাঙা আলোয় মেঘ জড়ানো দূরের পাহাড়ী চূড়াগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ে। গিরিখাদ আর পাহাড়ী নদী ছাপিয়ে যখন বৃষ্টি নামে সমস্ত পরিবেশটাই তখন মনে হয় কেমন যেন অবাস্তব আর রঙিন একটা রূপকথার মতো।

সিগারেট ধরিয়ে গল্প করতে করতেই আমি ছোট মেয়েটি প্রসঙ্গে সেরেন্তর মুখ থেকে শোনা কথাগুলো স্ত্রীকে বললাম। ও নীরবে সব শুনলো, একটা কথাও বললো না। অথচ আমি জানি বেদনায় বুকের ভেতরটা ওর ভারি হয়ে উঠেছে। জোরে জোরে বৃষ্টির ছাঁট আসায় আমরা নিচের রেস্তোরাঁয় চলে এলাম।

রেস্তোরাঁর পরিচালক যিনি—প্রজাতন্ত্রী স্পেনের একজন অধিবাসী, কুয়েরনাভাকায় প্রজাতন্ত্রী স্প্যানিশ সংগঠনের প্রধান—আমাদের দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ওঁনার নম্র হাসি আর উষ্ণ আন্তরিকতাই আমাদের আবার বাস্তব পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনলো। একসঙ্গে পানের জন্যে আমরা তাঁকেও আমন্ত্রণ জানালাম। জীবন, কসাই ফ্রাঙ্কোর পতন আর মাদ্রিদ যেদিন ফ্যাসিজমের কবরভূমি হবে—তার উদ্দেশ্যে আমরা পান করলাম। তারপর আমরা পান করলাম মেক্সিকোর উদ্দেশ্যে—যে মেক্সিকো মায়ের মতো নিপীড়িত, পলাতক আর ক্ষুধার্তকে স্থান দিয়েছে

নিজের কোলে ; যে মেক্সিকো নিঃস্ব, রিক্ত, রক্তাক্ত—সে মেক্সিকো নয় ; যে মেক্সিকো অতীত স্মৃতি আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র ক্রোধে ক্ষুব্ধ, সেই মেক্সিকোর উদ্দেশ্যে।

পান শেষে আমরা ঘরে ফিরে এলাম, দেখলাম বৃষ্টি আর প্রচণ্ড বিদ্যুৎ-চমকের ভয়ে পালিয়ে এসে বাচ্ছারা ঘরের মধ্যেই লুকোচুরি খেলছে। আমাদের দেখে ওরা জিগেস করলো খারাপ কিছু ঘটেছে কি না। বুকের মধ্যে নিবিড় আলিঙ্গনে ওদের জড়িয়ে ধরে আমরা আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'খারাপ কিছু ঘটেনি, সোনামণি। আমরা শুধু চাই জীবনে তোমারা বলিষ্ঠ, দীপ্তিউচ্ছল আর নির্ভিক হয়ে বেড়ে ওঠো!'

প্রায় সপ্তাখানেক বাদে, কুয়েরনাভাকার বাজার অঞ্চলের ভিড়ে ঠাসা সংকীর্ণ একটা পথ—গুয়েরেরো ধরে হাঁটছি, হঠাৎ লোকটার সঙ্গে আবার আমাদের দেখা হয়ে গেলো। এবারেও সে গাধায় চড়ে ধীরে ধীরে আমাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে।

'এই, দ্যাখো ; ওই যে যাচ্ছে!'

স্ত্রীই প্রথম দেখতে পেয়ে আমাকে বললো। যেন ওর সচকিত কণ্ঠস্বরের জবাবে লোকটা শুধু একবার চোখ তুলে তাকালো। ইশ্ ওর মুখখানা কি ভীষণ বদলে গেছে! বেদনা-কাতর সেই নির্মল প্রশান্তির কোথাও কোনো চিহ্ন নেই, তার পরিবর্তে ফুটে উঠেছে প্রচ্ছন্ন ক্রোধ, নিঃসীম তিক্ততা আর অনাগতের গভীর একটা অশুভ পূর্বলক্ষণ। অজস্র চিত্রকলা আর ভাস্কর্যের মধ্যে দিয়ে যিশুর যে কল্পরূপটা আমাদের মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে, তার কোনো চিহ্নই আর ওই লোকটার মধ্যে দেখতে পেলাম না, দেখলাম দুঃখের ভারে জর্জরিত ভগ্নহৃদয় একটি সাধারণ মেক্সিকান চাষী আর তার সেই ভয়ঙ্কর চাপা ক্রোধ, যা একদিন পৃথিবীকে বিস্মিত করে দিয়েছিলো, ভবিষ্যতেও দেবে।

তবু, এত অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও, লোকটার মুখখানা সত্যিই ঠিক যিশুর মতো দেখতে।

ফিফথ্ এভিনিউয়ের এলমসফোর্ডে মিনার-চূড়ার কোনো ঘরে বাস করার সবচেয়ে বড় সুবিধে—সেই তলায় লিফট্ থামা ছাড়া আর কেউ কখনও বিরক্ত করতে আসবে না। নিউ ইয়র্ক শহরে বাস করতে গিয়ে এর চাইতে বেশি নির্জনতা কেউ স্বপ্নেও আশা করে না, এবং হার্ভে ক্রেনও প্রয়োজন বোধে সেই নির্জনতাই উপভোগ করে আসছে। তার ধারণা এই নির্জনতা উপভোগ করার অধিকার সে অর্জন করেছে। ক্রেনের বয়েস ছেচল্লিশ, বেশ লম্বা, চওড়া কাঁধ, রীতিমতো পৌরুষদীপ্ত চেহারা, কেবল শক্ত করে আঁটা কোমরবন্ধের নিচে যা সামান্য একটু মেদ জমতে শুরু করেছে। তার ধারণা, ছেচল্লিশের মধ্যে পঁচিশটা বছর যার নিজের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে তুলতেই কেটে গেছে, তার সামান্য কিছু গোপনীয়তা উপভোগ করার যথেষ্ট অধিকার আছে।

সুতরাং সপিনাটা হাতে এসে পৌঁছনোর পর. নির্জনতা বিঘ্নের একটা প্রচ্ছন্ন আঘাত—অন্তত আশঙ্কা আর বিস্ময়ের মিশ্র প্রতিক্রিয়াকে অতিক্রম করে এসে এলমসফোর্ডে মিনারাবাসের এই নিবিড় প্রশান্তির তুলনায়—নির্জনতা ভঙ্গের প্রচ্ছন্ন একটা আঘাত সে অনুভব না করে পারেনি। তবে গত পাঁচ বছর ধরে যে আতঙ্ক আর আশঙ্কার নগ্ন চেতনাটা তার মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিলো, সেই তুলনায় তেমন বিচলিত না হয়ে সে মনে মনে ভাবলো :

'বাঃ, চমৎকার, বছরে সাত হাজার ডলার ভাড়া গুনে যদি এর চাইতে বেশি কিছু আশা না করা যায়, তাহলে চুলোয় যাগ্‌গে মিনারাবাস!'

সপিনাটা সে আর একবার পড়লো, নিজেই মিশিয়ে নিলো খানিকটা পানীয়—যদিও তখন সবে দুপুর, তারপর তার উকিল

'হেণ্ডারসন, হক, বেইলি অ্যাণ্ড কোহেন' সংস্থার জ্যাক হেণ্ডারসনকে ফোনে ডাকলো।

'জ্যাক,' লাইনে হেণ্ডারসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরে ক্রেন বলে উঠলো, 'জ্যাক, শোনো···মিনিট পাঁচেক আগে সবচেয়ে বিরক্তিকর আর জঘন্য ব্যাপারটাই ঘটে গ্যাছে। আশা করি তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছো···'

হেণ্ডারসন কিছুই অনুমান করতে পারলেন না, শুধু এটুকু অনুভব করলেন—যাই ঘটুক না কেন, উত্তেজিত না হয়ে ক্রেনের উচিত ব্যাপারটাকে সহজভাবে মেনে নেওয়া।

'এই জন্যেই তো আইনজীবীদের আমি এত ভালোবাসি,' প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ মেশানো স্বরে ক্রেন বললো। 'সারা পৃথিবীর দম বন্ধ হয়ে গেলেও আমার একটুও উত্তেজিত হওয়া চলবে না! এবং সত্যি বলতে কি জ্যাক, আমি এতটুকুও উত্তেজিত হইনি—ঠিক একটা শসার মতোই একেবারে শান্ত হয়ে রয়েছি। দরজার কড়া নেড়ে এইমাত্র আমাকে একটা সমন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে অ-মার্কিনসুলভ কার্যাবলীর জন্যে আমাকে আগামীকাল হাউস কমিটিতে হাজির হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর পরেও কি তুমি বলতে চাও আমি এতটুকু উত্তেজিত হবো না?'

হেণ্ডারসন অকপটেই স্বীকার করলেন ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। তবে এটাও ঠিক, এই ধরনের উদ্বিগ্নতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও নেই। শান্তস্বরে, অত্যন্ত মাপা গলায়, উষ্ণ আন্তরিকতার সঙ্গেই তিনি ব্যাখ্যা করে বোঝালেন যে বাস্তব এক ধরনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এই বিপদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তাই নিতান্ত সাধারণ একজন ব্যবহারজীবীর চাইতে বরং অন্তরঙ্গ একজন বন্ধু কিংবা পারিবারিক চিকিৎসকেরই মতো হেণ্ডারসন হার্ভে ক্রেনকে উপদেশ দিলেন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে, সামান্য কিছু পান করে, বিকেল তিনটে নাগাদ

সে যেন একবার ওঁর দফতরে দেখা করে। ওঁর কথা বলার ভঙ্গিতে এমন একটা আশ্বাস ছিলো, যাতে ক্রেন কিছুটা স্বস্তি বোধ না করে পারলো না।

সপিনাটা পাওয়ার মুহূর্ত থেকে যে অস্বস্তিটা তার মনের মধ্যে দানা বেঁধেছিলো, দূরভাষে হেণ্ডারসনের সঙ্গে কথা বলার পর সেটা মিলিয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—তার সাম্প্রতিক মঞ্চস্থ নাটকের যে বড় আকর্ষণ, সেই ম্যাডালিন ব্রিগস্-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বপ্রতিশ্রুতি ভেঙেই সে তার আগেকার স্ত্রী জেনকে দুপুরে তার সঙ্গে খাওয়ার জন্যে মিনতি জানালো। জেন যখন জানালো যে ওর আগে থেকেই অন্য এক জায়গায় খাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে, ক্রেন তখন বললো সে নিজের প্রতিশ্রুতি ভেঙেই ওকে আহ্বান জানাচ্ছে, কেননা ওকে তার সত্যিই পাগলের মতো প্রয়োজন। যা ঘটতে চলেছে, তার সারাটা জীবনে এমন মারাত্মক ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। সুতরাং ওকে আজ দুপুরে তার সঙ্গে খেতেই হবে, কোনো অজুহাত সে শুনবে না।

ক্রেন জানে এই ধরনের মিনতিতে কাজ হবে, কেননা বরাবরই তাই হয়ে এসেছে। দ্বিতীয় স্ত্রী, জেন সম্পর্কে অন্যভাবে বলা যায় যে ওর হৃদয় আছে এবং ক্রেন প্রায়ই যখন তার এ-হেন অন্তরঙ্গ বন্ধু, বিশ্লেষককে তার দ্বিতীয় বিবাহের সবচেয়ে গভীর অসুবিধের কথাগুলো বলে, তখন স্বামীর চাইতে নিজেকে তার জেনের ছেলের মতোই মনে হয়—তার মানে এই নয় যে ও যথেষ্ট তরুণী এবং রীতিমতো আকর্ষণীয়া, তার চাইতে বড় কারণ ক্রেনের দুঃখকে ও নিজেরই দুঃখ বলে মনে করে, বিশেষ করে ক্রেনের গভীরতম দ্বিধাদ্বন্দ্বে ও সত্যিই সংবেদনশীল। তার প্রথম স্ত্রী, অনিতা ক্রুস, আশ্চর্য রূপসী এবং অভিনেত্রী, যার সঙ্গে হলিউডে প্রথম অভিনয় করতে এসে তার দেখা হয়েছিলো। ভদ্রমহিলা নিজের সম্পর্কে, বিশেষ করে নিজের মুখ আর শরীর সম্পর্কে এত বেশি সচেতন ছিলো যে, ক্রেনের ভাষায় বলা যায় ওর ভক্তেরা তাকে ওর সঙ্গে প্রায় মায়ের মতোই ব্যবহার করতে বাধ্য করাতো।

কিন্তু ক্রেনের স্বভাব গঙ্গাফড়িংয়ের মতো এক সীমা থেকে আর এক সীমাকে হেলায় অতিক্রম করে যাওয়া।

'শোনো হার্ভে', দূরভাষে জেন বললো, 'বিবাহ-বিচ্ছেদের পর আমাদের দুজনের যখন ছাড়াছাড়ি হয়েই গ্যাছে, তখন তুমি কেন ভাবছো যে আমি তোমাকে ছেড়ে এসেছি কেবল মনোবিদ্যার পেশাদারী বিশ্লেষক হিসেবে কাজ করবো বলে?' রূঢ়তার পরিবর্তে আরও কোমল হয়ে উঠলো জেনের কণ্ঠস্বর। 'কখনও কোনো অসুবিধে হলেই তুমি আমাকে ডেকে পাঠাতে পারো না। অন্তত তোমার এই অভ্যেসটা ত্যাগ করা উচিত, হার্ভে...' ক্রেন অনুমান করতে পারলো ভেতরে ভেতরে ও যেমন বিব্রত বোধ করছে, তেমনি আবার স্তাবকতায় প্রায় গলেও এসেছে, সুতরাং পক্ষান্তরে জয়ী হয়েছে সে-ই। আগে তারা যখন বিবাহিত জীবন যাপন করতো, এখন তার চাইতে ওকে কেন যে এত বেশি প্রয়োজনীয় আর আকর্ষণীয়া মনে হয় ভাবতে তার নিজেরই অবাক লাগলো। পরক্ষণেই আবার ওর প্রতি আদেশ করার, এমন কি জবাব আদায় করে নেবারও যে একটা ক্ষমতা আছে—এই বোধটা তাকে বিপুল আনন্দে ভরিয়ে তুললো; যদিও অনেকেরই ধারণা, যারা সমস্ত ঘটনাটা জানে না, তারা ভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদে তাকেই বুঝি সবচেয়ে লজ্জাকর ভূমিকাটা পালন করতে হয়েছে। '...কেননা আর যাই হোক, আমি তোমার উপদেষ্টা বা নির্ধারক নই, হার্ভে। তাছাড়া সত্যিকারের অসুবিধেটা কি ধরনের না জেনে...'

দ্রুত বাধা দিয়ে ক্রেন ওকে আশ্বস্ত করলো যে এটা এমনই একটা ব্যাপার যা ফোনে আলোচনা করা যায় না, সুতরাং বারোটা পঁয়তাল্লিশে ও যেন অতি অবশ্যই তার সঙ্গে প্লাজায় দেখা করে।

দুপুরে খাবার ব্যবস্থাটা পাকা করে ফেলার পরক্ষণেই তার আদেশ করার ক্ষমতাবোধটা কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়লো, সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো বৈদ্যুতিক সিঁড়ি-চালকের ওপর, যে পরওয়ানা জারী করতে আসা লোকটাকে একেবারে তার দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে।

এই প্রথম সত্যিকারের ভয়ের হিমেল মাকড়শাগুলো বুকে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে লাগলো তার ঘাড় আর মেরুদণ্ডের চারপাশে, রক্ত চলাচলের মতো প্রবাহিত হয়ে যেতে লাগলো হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায়। সমস্ত ব্যাপারটাই এমন আকস্মিকভাবে তাকে স্থবির করে দিলো যে প্রকৃত ভয়টা সম্পর্কে সে ভাববার কোনো অবকাশই পেলো না। তার সমস্ত ভাবনাটাই যেন একটা বৃত্তের মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে বারবার ঘুরপাক খেতে লাগলো—'এই শেষ! সব শেষ! বেরুবার আর পথ নেই! কোনো পথ নেই! সব, সব শেষ!' তারপর হঠাৎই এক সময় তার ভাবনা বৃত্ত ভেঙে অতীত ধরে ছুটতে শুরু করলো এবং কেন জানি নিজেই নিজের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। এই তীব্র ক্রোধই তাকে সাহায্য করলো, কেননা এই ক্রোধের মধ্যে বিপদের কোনো সম্ভাবনা জড়িত ছিলো না। তাই পোশাক পালটে পরিপাটি হয়ে, সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো, কিন্তু থমথমে ভাবটা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতেও পারলো না।

প্লাজায় জেনের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়েও বিষণ্ণতার হালকা রেশটুকু তখনও জড়িয়ে ছিলো। তবু নিজেকে তার কেমন যেন বীরের মতো মনে হলো, মনে হলো শহিদের মতো। কিন্তু ঝরনা অতিক্রম করে হোটেলের দিকে যাবার সময় নিজেকে তার সব চাইতে বেশি করে মনে হলো কোনো শহিদী বীরের মতো। জেন রয়েছে ঠিক তার সামনে। মৃদু হেসে তাকে অভিবাদন জানানোর ভঙ্গিতে ক্রেনের মনে হয়েছে তাকে দেখে জেন খুশিই হয়েছে। ছিপছিপে দীর্ঘ দেহ, একরাশ কোঁকড়ানো চুল, সুন্দর সুগঠিত তনুরেখা। অত্যন্ত সাধারণ ধূসর ফ্যানেলের পোশাকেও এমন আশ্চর্য আকর্ষণীয়া মনে হচ্ছে যে চকিত কামনায় ক্রেনের বুকের ভেতরটা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। কামনার সঙ্গে অতীত রাগের অবশিষ্টাংশ মিশে তার মধ্যে নতুন ধরনের এমন একটা বোধ জাগিয়ে তুললো, যা একই সঙ্গে কামনাবিধুর অথচ কাব্যিক। এই ধরনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আগে আর কখনও পরিচয়

ঘটেনি, এমন কি আবেগঘন আপ্লুত রাত্রির উত্তাল মুহূর্তগুলোতেও নয়।

'তোমাকে কেমন যেন অন্যরকম দেখাচ্ছে, হার্ভে!' শঙ্কাতুর গলায় তার আগের স্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করলো। 'সত্যি কোনো খারাপ খবর নয় তো?'

আলোচনা শুরু করার আগে ক্রেন খাবারের ফরমাস দিলো, তারপর ওকে সমস্ত ঘটনাটা বললো।

'ব্যাপারটা কি সত্যিই মারাত্মক, হার্ভে?' জেন অবাক চোখ মেলে তাকালো। 'আসলে কি জানো, তোমার ধ্যান-ধারণাগুলোর সঙ্গে আমি কোনোদিনই তেমন একমত ছিলাম না। আমার ধারণা, আমি হচ্ছি প্রাচীন ধরনের সংরক্ষণশীল মহিলা, আর তুমি সংস্কারহীন, স্বাধীন···সব সময়েই উত্তেজনায় ছটফট করো। অর্থাৎ আমি যখন বিশ্বাস করি কোনো কিছুই ঠিক নয়, সব কিছুরই পরিবর্তন হতে বাধ্য, তুমি তখন সুস্থিরভাবে কোনো কিছুকেই আঁকড়ে ধরতে পারো না। তোমার এই ব্যাপারটা কি খবরের কাগজের সেই পঞ্চম সংশোধনী, যার সম্পর্কে সবাই বলাবলি করছে?'

'হ্যাঁ, ওটাই।' হার্ডসন নদী থেকে ধরা শ্যাড মাছের ডিমের বড়াগুলো আনাড়ির মতো গোগ্রাসে গিলতে গিলতে ক্রেন কোনো রকমে বললো। 'ওটা এমনিই একটা সর্বনাশা সংশোধনী যে তুমি যদি ওদের প্রশ্নের জবাব না দাও, তাহলে যেটা ঘটবে তা হলো—তুমি আর কোথাও কাজ করতে পারবে না, তোমার নতুন কোনো নাটক মঞ্চস্থ করতে দেওয়া হবে না। সংগীতের নতুন পরিকল্পনাটার জন্যে আমরা যে তিন লক্ষ ডলার চাঁদা তুলেছিলাম, তারও বারোটা বেজে যাবে। হলিউড আর দূরদর্শনে অভিনয়ের এখানেই ইতি। তার মানে নতুন আর কিছু ঘটবে না, সব কিছুর এখানেই শেষ।'

'এই, এত তাড়াতাড়ি খেও না, লক্ষ্মীটি! জেন তাকে স্মরণ করিয়ে দিলো, এমন ভাবে ও কথাগুলো বললো যেন ক্রেন কোনো বাচ্ছা

ছেলে। 'খেতে বসে কথা বলতে গিয়ে তুমি এত তাড়াতাড়ি খাও যে ভালোভাবে হজম করতে পারো না। এতে তোমার অ্যালসারের আরও ক্ষতি হবে। আমার মনে হয় লবণ-জরানো শূয়োরের মাংসের সঙ্গে অতগুলো শ্যাড মাছের ডিমের বড়া খাওয়াটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।'

'আমার খাওয়া নিয়ে তোমাকে এত মাথা ঘামাতে হবে না। এখন সামনে যে বিপদ, তার সঙ্গে আমি একা জড়িত নই। তুমি বুঝতে পারছো না—আমার নিজের চাইতেও এ দায়িত্ব কত বড়! তোমাকে সপ্তায় যে ছুশো করে ডলার দিই সেটা তো আছেই, তার ওপর আমার নিজের জন্যেও বছরে কমপক্ষে আশি হাজার ডলার রোজগার দরকার। বিলাসিতা নয়, অত্যন্ত সাধারণ ভাবে খেয়ে-পরে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে ওই টাকাটা আমার নিতান্তই প্রয়োজন।'

'নিশ্চয়ই, আমি জানি হার্ভে।' সমবেদনায় আরও কোমল হয়ে উঠলো জেনের কণ্ঠস্বর। 'আর সেই জন্যেই তো আমি সব সময় তোমার পাশে এসে দাঁড়াই। আমি জানি একজন সৃজনশীল শিল্পী হওয়ার অর্থ কি। আর আমি সেটা বুঝতে পারতাম বলেই সব কিছুকে সহ্য করতাম, মানিয়ে নিতাম। বিবাহ-বিচ্ছেদ আমি নিজেই চেয়েছিলাম হার্ভে, তাই কি না বলো?'

'আমাদের বিয়ে কিংবা সে সম্পর্কিত কোনো ব্যাপার এটা নয়, সোনামণি!' আর্তস্বরে হার্ভে ক্রেন বলে উঠলো। 'তুমি বুঝতে পারছো না—আমি এখন একটা শয়তানের বাসার মধ্যে কি রকম ছটফট করছি।'

'আর সেই জন্যেই তো আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। 'সাহায্য' শব্দটা কি এখানে বিশেষ অর্থবহ নয়, হার্ভে? হয়তো ওরাও তোমাকে ডেকেছে তোমার 'সাহায্য' ওদের বিশেষ প্রয়োজন বলে। বিশ্বাসঘাতকদের থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত রাখার জন্যে যেসব মানুষ আমাদের সাহায্য করেন, তুমি হয়তো তাদেরই একজন। হয়তো পঞ্চম সংশোধনীর সঙ্গে তোমার আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। অন্তত আর

কিছু না হোক, গত পনেরো বছরে তুমি এমন কিছু লেখোনি যা ওদের কাছে মনে হতে পারে ক্ষতিকর।'

'আজকের দিনে কি ক্ষতিকর, আর কি ক্ষতিকর নয়—একমাত্র ঈশ্বরই জানেন!'

'তুমি ওদের বলতে পারো বহু বছর আগে তুমি যে নাটকগুলো লিখেছিলে, ওগুলো নিতান্তই নির্বোধ তারুণ্যের খেয়ালে লেখা। আর তখন তুমি ভীষণ গরীব ছিলে। আশা করি নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে, তুমি সব সময়েই বলতে 'সূর্যটা উত্তাপ দিয়ে যাক' নাটকটা যখন লিখছিলে সেই তিনটে সপ্তা কেবল কয়েক টুকরো রুটি আর জল খেয়েই কাটিয়েছো। ও রকম একটা পরিস্থিতিতে ওরা এর চাইতে আর বেশি কি আশা করতে পারে বলো?'

'তার মানে আমি যা লিখেছি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবো? নষ্ট করে ফেলবো? তাকে অস্বীকার করবো? না, কক্ষনো নয়!' ক্রেনের বুকের থেকে কে যেন আর্তনাদ করে উঠলো। 'ওগুলোর মধ্যেই আমার সত্যিকারের প্রতিভার সাক্ষর রয়েছে। হ্যাঁ, বলতে পারো—আমেরিকান ধাঁচের জীবনযাত্রার সঙ্গে তার কোনো মিল নেই··· আর নেই বলেই আমি জানি, আমার নাটক ওদের কাছে ক্ষতিকর মনে হবে। কিন্তু আজকের দিনে ছাইভস্ম যা সব লিখি, সেই তুলনায়—অন্তত ভাবনার গভীরতা আর সংলাপের দিক থেকে ওগুলো সত্যিই অনেক ভালো!'

'তুমি কিন্তু বড্ড বেশি চেঁচাচ্ছো, হার্ভে।' আবদারের ছলেই জেন ছোট্ট করে ধমক দিলো। 'আসল কথা হচ্ছে, আজকে দিনে হলে তুমি কিন্তু ওসব লিখতে না, লিখতে বলো?'

'হয়তো না।'

'আর ছোটবেলায় যা করেছো তার জন্যে চিরকাল তুমি দায়ী থাকতে পারো না।'

'বাইশ বছর বয়েসে কেউ ছোট থাকে না, জেন।'

'হ্যাঁ, তখন তুমি ছোটই ছিলে। আর তোমার নিজের বলতে তখন একটা পয়সাও ছিলো না।'

'তা অবশ্য সত্যি। তখনকার দিনগুলো যে কি ভাষণ রুক্ষ ছিলো, তুমি হয়তো কিছুটা বুঝতে পারবে। কিন্তু সবচেয়ে মুশকিল কি হয়েছে জানো—যারা রূপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্মেছে, তাদেরকে ব্যাপারটা বোঝানো সত্যিই খুব কঠিন। সত্যিকারের দারিদ্র্য কি তারা কোনো দিনই বুঝতে পারবে না। আমার ধারণা, আমি হয়তো কোনোদিন তোমাকেও বোঝাতে···'

'হার্ভে,' দ্রুত বাধা দিয়ে শান্ত স্বরেই জেন বললো, 'দারিদ্র্য কি আমরা সবাই জানি, নতুন করে বোঝানোর আর কোনো দরকার নেই। কিন্তু তুমি এমন ভাবে কথাটা বলছো যেন গরীব হওয়াটা একটা গর্বের ব্যাপার। হ্যাঁ হার্ভে, যেহেতু ছোটবেলা থেকে আমি একটা স্বচ্ছল পরিবারে মানুষ হয়েছি, তুমি বরাবরই আমাকে ভাবতে বাধ্য করিয়েছো আমি যেন বাইরের লোক। কিন্তু তুমি তো নিজে চোখেই দেখতে পাচ্ছো, গরীব হয়ে তোমার লাভটা কি হয়েছে বলো? শুধু সেইসব ভয়ঙ্কর মানুষদের সম্পর্কে কয়েকটা নাটক লিখেছো, যারা দেশের নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙে জোর করে সরকারকে উচ্ছেদ করতে চায়।'

'মোটেই ভয়ঙ্কর নয়, তারা শুধু গরীব মানুষ। তারা কোনোদিনই সরকারকে উচ্ছেদ করতে চায়নি। তারা শুধু চেয়েছিলো সব কিছুকে সুন্দর করে পেতে। তারা সত্যিকারের স্বাভাবিক মানুষ, জেন। আমি শুধু তাদের হতাশা, বেদনা, তাদের নিপীড়নের নগ্ন দিকগুলোকেই তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। আমেরিকান ধাঁচের জীবনও কি চায় না যে জীবন-যাত্রার মান আরও উন্নত হোক, আরও সুন্দর হোক?'

'আমিও তো ঠিক সেই কথাই বলছি, হার্ভে। তুমি শুধু তোমার শেষ চারটি মঞ্চস্থ নাটকের কথা একবার ভেবে ছাখো—ওগুলো সেই সব মানুষদের সম্পর্কে লেখা যারা আমেরিকান জীবনধারার সঙ্গে একাত্ম এবং ওই নাটকগুলোই তোমার সব চাইতে বেশি সফল হয়েছে। সত্যি

বলতে কি, ওই নাটকগুলোই প্রমাণ করেছে যে আমেরিকান ধাঁচের জীবনযাত্রার ধারাকে শক্তিশালী করতে তুমিও যথেষ্ট সাহায্য করেছো। তুমি কি ভাবো গত দু-বছরে পরিচালন সভার কোনো সদস্য তোমার কোনো না কোনো নাটক ছাখেননি?'

'হয়তো দেখেছে।'

'নিশ্চয়ই দেখেছেন। তাহলে ওঁরা কেন মিছিমিছি তোমার ওপর ক্রুদ্ধ হতে যাবেন বলো? এখন তোমাকে শুধু যা করতে হবে—ওঁদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে তুমি তখন গরীব ছিলে এবং ভুল করে ওই সব ভয়ঙ্কর লোকের মিথ্যে আর ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়ে ছিলে। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো—ভয়ঙ্কর বলতে সেই সব লোকদেরই বোঝাতে চাইছি, একদিন যাদের সঙ্গে তুমি মেলামেশা করতে, গ্রুপ থিয়েটার কত সুন্দর সে সম্পর্কে যারা বলাবলি করতো। মোট কথা, তোমাকে এমন একটা ভাব দেখাতে হবে যেন তুমি ইহুদি নও।'

'ইহুদির সঙ্গে এর সম্পর্ক কি?'

'হার্ভে, লক্ষ্মীটি, শোনো, তুমি ভালো করেই জানো ইহুদি বিদ্বেষী আমি নই। আমার সবচেয়ে যে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সেই অ্যালিস উল্‌ফও একজন ইহুদি। কিন্তু প্রকৃত সত্য যা, ওরা আসলে ইহুদিদের ঠিক পছন্দ করে না। তুমি ওদের বলতে পারো যে তোমার পূর্বপুরুষরা ১৭৯৪ সাল থেকে এখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করে আসছে। আশা করি তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, মার্টিন লিল্যাণ্ড কমিটির সামনে দাঁড়িয়ে কমিউনিস্টরা কি ভাবে মিথ্যার ছলনার আশ্রয় নিয়ে তাঁকে প্রতারিত করেছে বলতে বলতে তিনি এত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে দূরদর্শনের ক্যামেরার সামনেই ঠিক বাচ্চাদের মতো ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন...'

'হা, ভগবান, তুমি কি চাও আমিও সবার সামনে ওরকম ভাবে কাঁদি? না না, ও জিনিসটা আমি সত্যিই ঘেন্না করি!'

'তোমাকে কাঁদার কথা আমি বলিনি, হার্ভে। আমি শুধু বোঝাতে

চেয়েছিলাম মার্টিন লিল্যাণ্ড এত বিশ্বস্ত যে ওঁরা তাঁকে কোনো রকম সন্দেহই করেননি। তারপর তিনি যখন বললেন তাঁর ঠাকুর্দা ক্লিভল্যাণ্ড না তলেদো, না কি কোথাকার যেন পুলিস-অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন ওঁরা সত্যি সত্যিই বুঝতে পারলেন যে তিনি একজন প্রকৃতই আমেরিকান নাগরিক, ধ্বংসকামী কোনো ব্যক্তি নন। সব শেষে তিনি যখন শপথ করলেন যে যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন তিনি কোনো দলে যোগ দেবেন না বা কোনো কিছুতে সই করবেন না, কেননা রাজনীতির সঙ্গে এখন তাঁর আর কোনো সম্পর্ক নেই—তখন ওঁরা স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে আমেরিকান জীবনধারার সঙ্গে তিনি কি গভীর ভাবেই না একাত্ম।' ক্রেন মন দিয়ে চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলো, জেন উৎকণ্ঠিত চোখে তার দিকে তাকালো।' আমি কি বলতে চাইছি তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, হার্ভে ?'

'কিন্তু মর্যাদার প্রশ্নটাও এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে, জেন।' অত্যন্ত ধীরে ধীরে কেটে কেটে উচ্চারণ করলো ক্রেন।

'দেশপ্রেমী হওয়ার মধ্যে অমর্যাদার প্রশ্নটাই বা আসছে কোত্থেকে আমি সেটাই বুঝতে পারছি না!'

'সেটা নির্ভর করে তুমি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা দেখছো তার ওপরে।'

'তোমাকে নিয়ে সবচেয়ে মুশকিল কি হয়েছে জানো, হার্ভে,' এমন অন্তরঙ্গতার সুরে জেন কথাগুলো বললো যে মুহূর্তের জন্যে ক্রেন, অন্তত তখন যে কারণে তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ আর ছাড়াছাড়ি হয়েছিলো, তার জন্যে অনুতপ্ত না হয়ে পারলো না। 'তোমার মতো এমন আদর্শবাদী আর জেদী মানুষ আমি সত্যিই খুব কম দেখেছি, আর সেই জন্যে তুমি আজও ঠিক ছোট বাচ্ছাটাই রয়ে গ্যাছো। আদর্শ নিঃসন্দেহে ভালো। কিন্তু তুমি এ কথা কেমন করে জানছো যে তোমার আদর্শটাই ঠিক ? আমার ধারণা সত্যিকারের সেইসব মানুষ যারা মনেপ্রাণে দেশের ভালো করতে চায়, তোমারও উচিত তাদের আদর্শকে মেনে চলা। এ কথা

তুমি অস্বীকার করতে পারো না—আজকে দিনে আদর্শবাদী যত দেশ, আমেরিকা নিশ্চয়ই তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। আবার পৃথিবীতে এমন বহু বিদেশী রাষ্ট্রও রয়েছে, যাদেরকে আমরা যদি সত্যিকারের সমর্থন না করি, তাহলে তাদের অস্তিত্ব এক সপ্তারও বেশি টিঁকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই বলছিলাম আদর্শ থাকাটা নিঃসন্দেহে ভালো, কিন্তু কখনও কখনও তা ভুলও তো হতে পারে।'

'কিন্তু এ লাঞ্ছনা, এ এক ধরনের আত্ম-অবমাননা জেন, যা সহ্য করা সত্যিই কঠিন!'

'নিশ্চয়ই কঠিন। কিন্তু তোমাকে আরও বড় হতে হবে। আর এ কথা বোঝার মতো তোমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, হার্ভে—অন্য কিছুর চাইতে বরং লাঞ্ছিত হলে তবু লোকে তোমাকে আরও বেশি সম্মান করবে।'

জেনকে পৌঁছে দিয়ে উকিলের সঙ্গে দেখা করার জন্যে হার্ভে ক্রেন একটা ট্যাক্সি ধরলো। পথে যেতে যেতে ভাবলো, তার পরিচিত সমস্ত মেয়েদের মধ্যে—যাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়—জেনের সঙ্গে কারুর তুলনাই হয় না। জেন সত্যিই দুর্লভ। ওর মতো মেয়ে অত্যন্ত ভাগ্যবান পুরুষেরও কপালে জোটে কি না সন্দেহ, অথচ সে এমনই নির্বোধ যে বিবাহবিচ্ছেদ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার মাথায় পাগলামির পোকাগুলো কিছুতেই শান্ত হলো না। এখন প্রকৃত সত্যটা সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছে। আজ তার যাকিছু করণীয় একা নিজেকেই করতে হবে, অথচ স্বানন্দে সবকিছুর মুখোমুখি দাঁড়াবার যোগ্যতা তার নেই। লাঞ্ছনা সম্পর্কে জেনের মন্তব্য কত স্বচ্ছ আর গভীর! তার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে থেকে প্রকৃত নম্র যদি কাউকে খুঁজে বার করতে হয়, তখন যেমন অসম্ভব হয়ে পড়ে, তেমনি সত্যিকারের লাঞ্ছিত কটা মানুষই বা হয়েছে! কেন জানি বাইবেলের একটা পংক্তি ক্রেনের বারবার মনে পড়ে যেতে লাগলো—"পবিত্র তারাই যারা নম্র, কেননা এ পৃথিবীতে তারাই রেখে যেতে পারে উত্তরাধিকার।" মনের গহনে প্রতিফলিত,

গভীর, দার্শনিক একটা অনুভূতি তাকে কিছুটা তৃপ্তি দিলো। মুহূর্তের জন্যে ক্রোধ আর ভয় ভুলে গিয়ে নিজেকে তার কেমন যেন উন্নত আর অভিজাত বলে মনে হতে লাগলো।

যার দুদিকে আকাশচুম্বী বড় বড় সব বাড়ি আর দুপাশের সংকীর্ণ পাশ-পথ দিয়ে হনহনিয়ে লোক চলেছে, সেই ব্রডওয়েতে ট্যাক্সি বাঁক নিতেই আত্মপ্রত্যয়ের ভাবটা ক্রেনের মধ্যে আরও তীব্র হয়ে উঠলো এবং বড় বড় এইসব দফতরে যারা প্রায় তাদের সারাটা জীবনই কাটিয়ে দিয়েছে—সেই সব নামহীন, মুখহীন, ত্রস্ত পায়ে হেঁটে চলা মানুষগুলোর প্রতি সে অনুকম্পা বোধ না করে পারলো না। এমন কি এদের মধ্যে থেকেই তার নতুন নাটকের উপাদান সংগ্রহ করা যায় কি না ভাবতে লাগলো। কিন্তু তা করতে গেলে যে ধরনের নানান অসুবিধে আর প্রতিহিংসামূলক যে সহজাত প্রবণতাগুলো দেখা দিতে পারে তার কথা ভেবেই সে ভাবনাটাকে একপাশে সরিয়ে রাখলো। এরই জন্যে এক-দিন তাকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছিলো, এবং কে বলবে এটা একজন শিল্পীর সত্যিকারে ভূমিকা। লাঞ্ছনা প্রসঙ্গে জেনের কথাগুলো সে নিশ্চয়ই স্মরণ রাখবে।

অত্যন্ত মূল্যবান আসবাবপত্র দিয়ে সুন্দর সাজানো 'হেণ্ডারসন, হুক, বেইলি অ্যাণ্ড কোহেন' সংস্থার প্রতীক্ষা-কক্ষটা পেরিয়ে যাবার সময়েও ক্রেন ওই অনুভূতিটাকে আঁকড়ে রাখতে পেরেছিলো। ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে অভ্যর্থনাকারী মেয়েটিকে সে মিষ্টি হেসে শুভেচ্ছা জানালো। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাক হেণ্ডারসন নিজে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলেন। ক্রেন তাঁকেও সেই একই ভঙ্গিতে মৃদু হেসে অভিবাদন জানালো।

'যাক, ঈশ্বরের অসীম কৃপা, সকালে যতটা মনে হয়েছিলো এখন আর তোমাকে ততটা উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে না!' অবাধ হাসিতে প্রসন্ন হয়ে উঠলো তাঁর সারা মুখ। চওড়া কাঁধ, বেশ শক্ত সামর্থ চেহারার মানুষ এই হেণ্ডারসন। অসময়ে পাক-ধরা একরাশ ঝাঁকড়া চুল, পরনে ধূসর

পশমী পোশাক, কালো রঙের ফাঁস-দেওয়া গলাবন্ধ। প্রথিতযশা ডাক্তারের মতো একজন সার্থক ব্যবহারজীবী হতে গেলে যে যে গুণগুলো থাকা দরকার, তার কোনোটারই অভাব হেণ্ডারসনের নেই। শান্ত, ধীর, আত্ম-প্রত্যয়ী ধরনের এই মানুষটা কাউকেই কোনো দিন হতাশ করেননি। এ হেন মানুষটাকে দেখেই সবাই যখন আশ্বস্ত হয়ে ওঠে, তখন তিনি যখন আবিষ্কার করবেন যে ক্রেন নিজেই নিজের সমস্যা সমাধান করে ফেলেছে, তখন তার মধ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে—কথাটা ভাবতেই ক্রেন মনে মনে বেশ মজা পেলো।

ক্রেনকে সঙ্গে নিয়ে হেণ্ডারসন তাঁর একান্ত-কক্ষে ফিরে এলেন। এ ঘরখানাও সুন্দর সাজানো আর আরামবহুল, যার খোলা জানলাগুলো দিয়ে চোখে পড়ে উপসাগর আর হার্ডসন নদীর মোহনা। বসার পর তিনি ক্রেনের কাছ থেকে সপিনাটা চাইলেন। তিনি যখন সেটা মন দিয়ে পড়ছেন, ক্রেন তখন হেণ্ডারসনের মুখোমুখি চামড়ার গদিআঁটা নরম কুর্সিটায় আয়েশ করে গা এলিয়ে দিলো।

'আমার ধারণা এ সম্পর্কে তুমি নিশ্চয়ই কিছু ভেবেছো,' নীরবতা ভেঙে জ্যাক হেণ্ডারসনই প্রথম কথা বললেন। 'তুমি যে তেমন উতলা হয়ে পড়োনি এর জন্যে আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। তার মানে আমি বলতে চাই না যে এটা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার নয়, বরং এটাকে গুরুত্বপূর্ণ একটা কদর্যতা বলতে পারলেই হয়তো সবচাইতে বেশি খুশি হতাম।'

'এটা পেয়ে আমি সত্যিই কিছুক্ষণের জন্যে মুষড়ে পড়েছিলাম জ্যাক,' ক্রেন নিঃসংকোচেই স্বীকার করলো। 'প্রথমে খুব ভাবলাম, তোমার সঙ্গেও যোগাযোগ করলাম, তারপর দুপুরে আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তারিত ভাবেই আলোচনা করলাম।' খাবার সময় জেনের সঙ্গে যা আলোচনা হয়েছিলো তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সে হেণ্ডার-সনকে জানালো। 'শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলাম, যৌবনে যা লিখেছিলাম সেগুলো যে ভুল, এমন কি আজকে দিনের ভাষায় যাকে বলে 'বিধ্বংসী'

—এ কথা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। যদি তেমন প্রয়োজন হয়, বলবো, তখন যা লিখেছিলাম তার জন্যে আমি অনুতপ্ত এবং ওগুলোকে নষ্ট করে ফেলতে রাজি আছি। অন্য ভাবে বলতে গেলে, আমি জানি জ্যাক, সৃজনশীল কোনো শিল্পীকে পরিণতি কিংবা স্থবিতার নির্দিষ্ট একটা কেন্দ্রে পৌঁছতে গেলে কোনো না কোনো ভাবে হীনমণ্যতা তাকে সহ্য করতেই হবে। হীনমণ্যতা, আত্মঅবমাননা বা লাঞ্ছনা—যে শব্দই ব্যবহার করা হোক না কেন, আমি আর তাতে ভয় পাই না।'

'হার্ভে!'

'বলো?'

'হার্ভে, শোনো!'

'কেন, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না, জ্যাক?'

'আরে, না না—নিশ্চয়ই, বিশ্বাস করি বইকি। কিন্তু সত্যি বলতে কি জানো হার্ভে, তুমি যা লিখেছো ওরা তার দিকে ফিরেও তাকায় না। ওরা কোনো বই পড়ে না, থিয়েটারেও যায় না। সেই জন্যে ব্যাপারটা যেমন সহজ, তেমনি আবার জটিলও বটে। হ্যাঁ, এটা তোমার যৌবনের ত্রুটি, কিন্তু তুমি যেভাবে দেখছো সেভাবে নয়। প্রকৃত ঘটনাটা হলো তোমার অতীত সম্পর্কে কেউ ওদের উস্কে দিয়েছে—হয়তো জানিয়েছে তুমি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলে, নয়তো যারা সভ্য তাদের সঙ্গে এক সময়ে তোমার যোগাযোগ ছিলো কিংবা এখনও আছে। সমনটায় যা বলা হয়েছে—ওয়াশিংটনে এসে সবকিছু স্বীকার করার জন্যে প্রস্তুত হও, নইলে আমরা তোমার ভবিষ্যৎ জীবন উচ্ছন্নে পাঠাবো। ভাষার কিছু তারতম্য ঘটলেও, মোদ্দা কথাটা কিন্তু এই।'

'তার মানে, তুমি কি বলতে চাও, ওদের ধারণা আমি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য?' বিস্মিত স্বরে ক্রেন ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলো। 'ব্যাপারটা কিন্তু সত্যিই উদ্ভট, জ্যাক!'

'নিশ্চয়, উদ্ভট তো বটেই।'

'কিন্তু তুমি কেমন করে এতটা সুনিশ্চিত হলে...'

'যেহেতু আমাদের সংস্থা ঠিক এই ধরনের আরও ছটা ঘটনার মোকাবিলা করছে। এই ঘটনাগুলোকে ওরা নিজেরাই সাজাচ্ছে। যদিও ওয়াশিংটন সম্পর্কিত এই ব্যাপারগুলো ঠিক আমাদের আওতার মধ্যে পড়ে না···'

'তাহলে এ সম্পর্কে তোমার কিছুই করার নেই?' চকিতে সোজা হয়ে বসে ক্রেন জানতে চাইলো। তার স্বর্ণীল সুখের অনুভূতিটা তখন উধাও হতে শুরু করেছে। 'যদি ওয়াশিংটনের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক থাকতো, তাহলেও কি তুমি ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করতে পারতে না? চুলোয় যাগ্‌গে জ্যাক, বছরে আমি তোমাকে পাঁচ হাজার ডলার পারিশ্রমিক দিই। তুমি কি ভাবো সেটা খেলনা? ওরা যদি ভেবে থাকে আমি কনিউনিস্ট, তাহলে ওদের সঙ্গে আলোচনা করাটা সহজ ব্যাপার হওয়া উচিত। তুমি নিশ্চয়ই অস্বীকার করবে না যে ওদের রাজনীতিবিদরা নরকেরই মতো কুৎসিত। হাজার ডলার দিয়ে শাসকসভার যে কোনো সদস্যকে কেনা যায়···'

'জানি, আমি জানি, হার্ভে। তুমি ভেবো না যে ও কথা আমি ভাবিনি। কিন্তু সমনটা ইতিমধ্যেই জারি করা হয়ে গ্যাছে, এবং এখন এটা জলের পাইপ আঁটার মতো সহজ ব্যাপার নয়। এখন যেটা করতে হবে, তা হলো—ওয়াশিংটনে যাবার জন্যে তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে, ওদেরকে সব কথা খুলে বলতে হবে, এবং সকালে যা বলেছিলাম—ভবিষ্যতে জীবনকে একটুও নষ্ট না করে সুনিশ্চিতভাবে এই ঝামেলার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।'

'আমিও কি ঠিক তাই বলতে চাইনি, জ্যাক?'

'না, ওভাবে নয়। তুমি যা লিখেছিলে তার জন্যে তুমি দুঃখিত, ভুল করেছো, ভুল পথে চালিত হয়েছো কিংবা যন্ত্র হিসেবে তোমাকে ব্যবহার করা হয়েছে—এসব বললে হয়তো কিছুটা লাভ হবে। এমন কি তুমি যদি ওদের বলো কমিউনিস্টদের মধ্যে থাকার ফলে কিভাবে তোমার মোহমুক্তি ঘটেছে, তাতেও হয়তো কিছুটা লাভ হতে পারে।

কিন্তু আমি কি বলতে চাইছি তুমি যদি বুঝতে পারো, তাহলে দেখবে যে ওটা একটা পটভূমি মাত্র। ওরা হয়তো জানতে চাইবে, তুমি যদি পার্টির সভ্য হও, তাহলে কবে সভ্য হয়েছিলে, কারা কারা সেই পার্টির সভ্য বা একসময়ে সভ্য ছিলো। অন্যভাবে বলতে গেলে, হার্ভে—ওরা যা চায়, তা হলো তোমার সহযোগিতা। ওরা তোমার কাছ থেকে নাম জানতে চাইবে। এখন তুমি কিভাবে তোমার শ্লেটটাকে পরিষ্কার করে মুছে ঝকঝকে করে তুলতে পারবে, সেটা তোমার ওপরেই নির্ভর করছে। আসলে তোমাকে নাম বলতে হবে।'

'তার মানে, আমি···আমি একজন গুপ্তচরের কাজ করবো?'

নিঃশব্দে ভর্ৎসনা করার ভঙ্গিতে হেণ্ডারসন মাথা নাড়লেন। 'না হার্ভে, না; ওই শব্দটা আমার আদৌ পছন্দ নয়। এখন থেকে আমরা ভাববো সহযোগিতার কথা।'

'আর আমি যদি তা প্রত্যাখান করি?' চকিতে মুখ তুলে মেজাজি গলায় সে প্রশ্ন করলো, মনে মনে ভাবলো—হেণ্ডারসনের মতো মানুষদের নিয়ে সবচেয়ে মুশকিল যেটা, তা হলো ওরা অসম্ভব সুবিধেবাদী! কৌশলে মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া ছাড়া ওরা আর কিচ্ছু জানে না। মানবিক মর্যাদা বলে যে একটা জিনিস আছে সেটা ওরা কিছুতেই বুঝতে চায় না।

'বেশ, তুমি যদি তাই করো··আমার মনে হয় সে সম্পর্কেও আমরা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারি। ধরো তুমি ওদের কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করলে, ওরা তোমাকে পঞ্চম সংশোধনী ধারার আওতায় ফেলতে পারে। তখন তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি বলতে যাকিছু সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমার আর কোনো নাটকই মঞ্চস্থ হবে না, তুমি কোথাও অভিনয় করতে পারবে না। নাটক সংক্রান্ত কোনো পত্রিকাতেও তোমার নাম উল্লেখ করা হবে না। হার্ভে, কিছু মনে করো না, আমি তোমাকে স্পষ্টই বলি—আমার মনে হয় তোমার অন্য কোনো আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়াই ভালো,

কেননা পঞ্চম সংশোধনী কমিউনিস্ট কোনো কেসের প্রতিনিধিত্ব আমরা করি না। আর দ্বিতীয় বিকল্প যেটা—মিথ্যে বলা। কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত হলে শপথ ভঙ্গের অভিযোগে পাঁচ বছরের কারাবাস ভোগ করতে হবে। এবং এ ক্ষেত্রে বলবো অন্য কোনো আইনজীবীর পরামর্শ নিতে, কেননা আমরা আমাদের কোনো মক্কেলকে শপথ ভঙ্গের উপদেশ দিতে পারি না।'

হঠাৎ হেণ্ডারসনের কণ্ঠস্বর বদলে গিয়ে আরও কোমল, আরও উষ্ণ আর আন্তরিক হয়ে উঠলো। 'এসব কথা নিজের মুখে তোমাকে বলতে হচ্ছে বলে আমি সত্যিই অনুতপ্ত হার্ভে। আমাদের কাজই হচ্ছে কোনো কেস হাতে আসার পর সম্ভাব্য সমস্ত দিকগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা এবং এমনভাবে কাজ করে যাওয়া যাতে সরাসরি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে বেরিয়ে আসা যায়। আমি তোমার আইনের উপদেষ্টা, একথা ভুলে যেও না হার্ভে। এখন আমরা এমন একটা সংকট-মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছি, যেখানে পরস্পরের কাছে কিছু গোপন করে কোনো লাভ হবে না। ধরো এই কেসটা আমরা হাতে নিলাম, তাহলে প্রথমেই প্রশ্ন আসবে—তুমি কি কখনও কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলে?'

'কেমন করে ও বুঝবে? কারুর পক্ষে কি বোঝা সম্ভব?' ক্রেন নিজের মনেই নিজেকে প্রশ্ন করলো। 'জ্যাক হেণ্ডারসনকে মিছিমিছি দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। বরং আমার গর্বিত হওয়াই উচিত যে জ্যাক হেণ্ডারসনের মতো একজন মানুষ আমার পাশে রয়েছে। কিন্তু আমি ওকে বোঝাবো কেমন করে? ক্ষুধায় প্রতিটা অন্ত্র যখন মুচড়ে ওঠে, ও কি কখনও অনুভব করতে পারবে সেই যন্ত্রণা? পকেটে দশ সেণ্টেরও কম মুদ্রা নিয়ে সারাটা সপ্তাহ ঘুরে বেড়ানোর অর্থ কি, ও কি কখনও জেনেছে? একমুঠো অন্নের জন্যে ওকে কি কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা সারিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে?' জেনের সঙ্গে কথা বলার পর যে উন্নত ধরনের মানসিক একটা প্রশান্তি সে সঞ্চয় করেছিলো, সেই তুলনায় অতীতের ওইসব স্মৃতি তাকে কেমন যেন একটা করুণ

বিষণ্ণতায় ভরিয়ে তুললো। আর একবার নিজেকে তার মনে হলো সে যেন আশ্চর্য সংবেদনশীল, অভিজ্ঞ কোনো মানুষ, যে অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বুকের অতলে ক্রেন স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারলো গভীর অথচ ক্রুদ্ধ একটা দাবদাহ, আর তার ভাবনার সেই বিশৃঙ্খল প্রবাহের মধ্যে থেকে দ্রুত ধেয়ে আসছে সৃজনশীলতার যত দুর্মর আর্তি, ভবিষ্যতে সে যা লিখবে তার আশ্চর্য স্বপ্নিল একটা অনুভূতি—লিখবে সত্তার গহনে যে দুঃসহ যন্ত্রণা, তার নাটক। শীতে-কাঁপা ক্ষুধার্ত গরীব মানুষদের মাধুর্যহীন স্থূল যন্ত্রণার কথা সে আর লিখবে না, লিখবে সেইসব মানুষদের কথা, যারা নিজেদেরই মনের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে, অবমাননা আর নীচতার মধ্যে থেকেই মাথা উঁচু করে বেরিয়ে আসে। তাই চাপা অথচ গাঢ় স্বরেই সে বললো:

'শুধু মক্কেল নয়, একজন বন্ধু হিসেবেই আমি তোমার কাছে এসেছি, জ্যাক। আমাকে দেখে তোমার যতটা একগুঁয়ে মনে হচ্ছে, সেটা আমার অভিজ্ঞতার অভাবে। এখন থেকে আমাকে চালানোর দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার ওপরে।'

'শুনে খুশি হলাম, হার্ভে। বিশ্বাস করো, সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। আশা করি এখন আমরা খোলাখুলিই আলোচনা করতে পারবো।'

হার্ভে ক্রেন অকপটেই স্বীকার করলো—কিভাবে চরম দারিদ্র্য, ভগ্ন হৃদয় আর হতাশার মধ্যেই সে ১৯৩৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলো। কত সহজেই না সে বন্ধু, অন্তরঙ্গ সাথী আর উষ্ণতাকে খুঁজে পেয়েছিলো, যারা মানুষের স্বপক্ষে এক নতুন ধরনের মঞ্চের স্বপ্ন দেখেছিলো—শিল্পী, সাহিত্যিক আর অভিনেতাদের সেই ছোট দলটার সে কত অনায়াসেই না একটা অংশে পরিণত হয়েছিলো···

'অন্যভাবে বলতে গেলে, ওরা তোমার সঙ্গে এক রকম ছলনাই করেছিলো,' যেন ব্যাপারটা আগে থেকেই জানতেন, এমনিভাবে

হেণ্ডারসন বোদ্ধার ভঙ্গিতে মুচকি মুচকি হাসলেন। 'পার্টিতে তুমি কতদিন সভ্য হিসেবে ছিলে?'

'১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত, যখন ব্রডওয়েতে আমার প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয়। সেটাই আমার জীবনে সফলতার প্রথম সোপান। এবং আমার ধারণা, তখনই আমার চেতনার প্রথম উন্মেষ ঘটে।'

'ঠিক আছে হার্ভে, তাহলে মোটামুটি ব্যাপারটা যা দাঁড়াচ্ছে, তা হলো—তুমি যখন পার্টির সভ্য ছিলে, তখন একটা দলের সঙ্গে তোমার পরিচয় ঘটে। এখন আমাদের নামের একটা তালিকা প্রস্তুত করতে হবে, আর যখন সময় আসবে তোমাকেও নামগুলো বলার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।'

'নাম বলতে হবে?'

'হ্যাঁ, হার্ভে।'

ক্রেন মুখ তুলে তাকাতে পারলো না। ম্লান স্বরে বললো, 'সত্যি বলতে কি…তুমি বিশ্বাস করো, জ্যাক—আমি কাউকে ঠিক মনে করতে পারছি না। ছোট দলটায় প্রায় সাত-আটজন ছিলো, এবং আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা…আপ্রাণ চেষ্টা করেও আমি ওদের নামগুলো কিছুতেই মনে করতে পারছি না…'

টানটান হয়ে উঠলো হেণ্ডারসনের সারা মুখ। 'তুমি কিন্তু একটু আগেই বলেছো আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবে। দ্যাখো হার্ভে, এক বছরের বেশি তুমি একটা দলের সঙ্গে মিশলে, অথচ তাদের কারুর নামই মনে করতে পারছো না, এটা কেমন করে সম্ভব বলো?'

'শোনো, জ্যাক, আমি তো বলেছি—আজ আমি তোমার কাছে এসেছি একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো, এবং সত্যিই তাই। ওই ছোট দলটার সবাই ছিলো কমিউনিস্ট, কিন্তু আমার ধারণা তাদের একজন ছাড়া, অন্তত আজকের দিনে, কেউই তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বাকি-গুলো কেবল নামেই এবং যথারীতি তারা আমার মন থেকে নিঃশব্দে

মুছে গ্যাছে। গ্রুপ থিয়েটারে অবশ্য আরও অনেকে ছিলো, যাদের কেউ কেউ আজ সম্মানীয় ব্যক্তি, কিন্তু কমিউনিস্টদের মধ্যে থেকে আমি কেবল একটা নামই স্মরণ করতে পারছি।'

'কে ?'

'গ্রান্ট সামারসন।'

হেণ্ডারসন অর্ধবৃত্তাকারে ভ্রূদুটোকে বেঁকিয়ে তুললেন।' 'তার মানে তুমি কি হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা গ্রান্ট সামারসনের কথা বলছো ?'

'হ্যাঁ।'

'উঃ, কি জঘন্য! গ্রান্ট সামারসন একজন কমিউনিস্ট! সত্যিই ভাবা যায় না! কিন্তু এতে আমাদের ছিটে ফোঁটাও কোনো লাভ হবে না, হার্ভে। তুমি কিছুতেই সামারসনের নাম উচ্চারণ করতে পারো না। তার কোনো প্রশ্নই আসে না।'

'কেন ?'

'কেন সেটা তো স্পষ্টই বুঝতে পারছো। খোঁজ নিলে হয়তো দেখা যাবে যে ওঁর পেছনে হয়তো ইতিমধ্যেই ষাট লক্ষ ডলার খরচ করা হয়ে গ্যাছে। উনি এখন জো লাঙ্কের সব চাইতে বড় সম্পদ এবং এই মুহূর্তে ব্রডওয়েতে ওর দুটো ছবির কাজ একসঙ্গে এগিয়ে চলেছে। সত্যি বলতে কি, লাঙ্কই 'স্টিলম্যান, লেভি অ্যাণ্ড স্মিথ' সংস্থার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে। এসব ব্যাপার তুমি হয়তো ঠিক বুঝবে না, হার্ভে। তবে, ওদিক দিয়ে গেলে আমাদের চলবে না। আর যাই হোক, আমরা কাউকে ভরাডুবি করে দিতে পারি না। কখনও কখনও আমাদের বিশ্রী পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় বটে, তবু আমরা এখনও আমেরিকান এবং আমাদের আমেরিকানদের মতোই ব্যবহার করা উচিত।'

'নিশ্চয়ই।' শব্দটা উচ্চারণ করার পর ক্রেন মনে মনে কিছুটা স্বস্তি পেলো। 'সামারসনের সর্বনাশ করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।'

'আমরা কেউই তা চাই না। তাছাড়া ওরা যখন চাইবে, কেবল তখনই নাম বলার প্রশ্ন আসবে। আচ্ছা, গ্রুপ থিয়েটারে আর কারা কারা ছিলো?'

'কিন্তু তারা কেউই কমিউনিস্ট নয়, জ্যাক।'

'তাতে কিছু এসে যায় না। বিধ্বংসীরা বিধ্বংসীই। তাছাড়া আরও একটা জিনিস, তুমি কেমন করে সুনিশ্চিত হলে যে ওরা কেউ কমিউনিস্ট নয়? এমন তো হতে পারে, তুমি ছেড়ে আসার পর ওরা পার্টিতে যোগ দিয়েছিলো? এক্ষেত্রে নিজেকে বিচারকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করাটা কি এক ধরনের ঔদ্ধত্য নয়, হার্ভে? একটু আগে তুমি নিজেই আত্ম-অবমাননার কথা বলছিলে।'

'হ্যাঁ, সেটা সত্যি।' ক্রেন অকপটেই স্বীকার করলো।

'তাহলে তোমার সেই সিদ্ধান্তে অটল থাকা উচিত। আমি জানি জোসেফ ফ্রেডম্যানের সঙ্গে তোমার এখনও বন্ধুত্ব আছে। ওকি তোমাদের ওই দলটায় ছিলো না?'

'ছিলো।'

'তাহলে ধরো, ওকে দিয়েই আমরা তালিকাটা শুরু করতে পারি।'

ক্রেনের মনে পড়লো—সে যা লিখতো ফ্রেডম্যানই প্রথম পড়তো, ফ্রেডম্যানই প্রথম তাকে দলে যোগ দেওয়ার জন্যে নিয়ে এসেছিলো, 'সূর্যটা উত্তাপ দিয়ে যাক' নাটকটা লেখার সময় ফ্রেডম্যানই তাকে অনুক্ষণ উৎসাহ দিয়ে গেছে। সত্যি বলতে কি, আজ সে যেখানে এসে পৌঁচেছে, জোসেফ ফ্রেডম্যানের সহযোগিতা ছাড়া তার পক্ষে কোনোদিনই এই অবস্থায় এসে পৌঁছনো সম্ভব হতো না। ফ্রেডম্যান আজ দূরদর্শনের পরিচালক, রীতিমতো ভালো মাইনে পায়, এ পৃথিবীতে কারুরই তোয়াক্কা করে না। অথচ সে, হার্ভে ক্রেন, আজ তাকে 'তদন্ত'-এর সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কি আর করা যাবে, ঈশ্বরের জাঁতাকলই যখন শস্য চূর্ণ করে চলেছে, তখন সেটা কেমন পেষাই হলো সেটা তোমার কোনো ব্যাপারই নয়।

'বেশ, তাই হোক,' শেষ পর্যন্ত ক্রেন সায় দিলো।

জোসেফ ফ্রেডম্যান আর প্যাট ম্যাকিনটস দুজনেই তাকে সমানভাবে সাহায্য করছিলো, অন্তত যেদিন সে সাধারণ মানুষের হয়ে তাদের দুঃখ-বেদনা আশা-আকাঙ্খার কথা লিখতে চেয়েছিলো।

'তাহলে জোসেফ ফ্রেডম্যানকে দিয়েই শুরু করো, আর তার সঙ্গে প্যাট ম্যাকিনটসের নামটাও যোগ করে নাও।'

'ম্যাকিনটস! তার মানে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, যিনি পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেন?'

'হ্যাঁ। একদিন ওরা আমার জন্যে কিছু করেছিলো, আজ আমি ওদের জন্যে কিছু করতে চলেছি।'

ক্রোধের মতো কেমন যেন একটা তীব্র ঋজুতায় তার বুকের ভেতরটা টানটান হয়ে উঠলো। সে যখন ছোট ছিলো, কাঁচা আর নিষ্পাপ—লক্ষ্য কি জিনিস যে তখনও বুঝতো না, তখন তাকে নিয়ে ওরা যেমন দুমড়ে মুচড়ে যা খুশি ব্যবহার করেছে, আজ ঠিক তেমনি ভাবেই সে ফিরিয়ে দেবে তাদের সেই শুভেচ্ছার প্রতিদান···

এমনি ভাবে তালিকায় যখন আঠারোটা নাম লেখা হলো—যাদের মধ্যে চারজন মৃত, ছজনের নাম বহু আলোচিত, আটজন নতুন, যাদের নাম কংগ্রেস-সভায় কখনও উচ্চারিত হয়নি—জ্যাক হেণ্ডারসনের তখন নিজেকে উপযুক্ত হাতিয়ারে কিছুটা সুসজ্জিত মনে হলো। সচিবকে ডেকে উনি তালিকাটার নকল করতে বললেন, তারপর নতুন একটা চুরুট ধরালেন। কাজটাকে সুষ্ঠুভাবে গুছিয়ে তোলার পরিতৃপ্তিতে উনি ক্রেনের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসলেন। 'তুমি ভেবো না এই নতুন আটটা নাম নিতান্ত তুচ্ছ কিছু। অবশ্য আমি জানি না এ দিয়ে ওয়াশিংটনের নেকড়েগুলোকে কতটা শান্ত করা যাবে, তবে সবটুকুই নির্ভর করছে তোমার ওপরে···ওই নামগুলোর অতীত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তুমি যতটুকু জানো তার ওপরে। একটা কোদালকে কোদাল বলার জন্যে তোমার এত উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়, হার্ভে। কমিউনিস্টদের জনসভায় তুমি

ওদের দেখেছো, এইটেই বড় কথা। নয়তো তখনকার সেই জনসভার দিনগুলোতে আবহাওয়া কেমন ছিলো, সে আলোচনা করার সত্যিই কোনো অর্থ হয় না। একটা কথা শুধু সব সময় স্মরণ রেখো—তুমি যা করছো সেটা তোমার দেশের মঙ্গলের জন্যেই। ধ্বংসকামী একটা অশুভ দলকে তুমি তাদের কাছে প্রকাশ করে দিচ্ছো, যারা অচিরেই ওদের বাগে আনতে পারবে, আর তার অর্থই হলো তুমি আমি আমরা সবাই রাত্তিরে একটু শান্তিতে ঘুমতে পারবো। এখন তোমাকে অনুরোধ করবো মন থেকে তোমার সমস্ত অতীতকে মুছে ফ্যালো। তোমার যা-কিছু উদ্বিগ্নতা চাপিয়ে দাও আমার কাঁধে। আজ তুমি আমেরিকান জীবনধারার সত্যিকারের একটা অংশ, যে জীবনধারার মূল্য আমাদের কাছে, এমন কি স্বাধীন সারাটা পৃথিবীর কাছেও অনেকখানি।'

'কিন্তু, ঈশ্বরের দোহাই জ্যাক, আমি ওখানে গিয়ে জনে জনে সাক্ষী-প্রমাণ দিতে পারবো না। তাছাড়া আমি ওখানকার কাউকে চিনিও না।'

'ও ভাবনা তুমি আমার ওপরেই ছেড়ে দাও না। কাল ভোরে ট্রেনে আমরা সাড়ে চারঘন্টা সময় হাতে পাবো। আলাদা সংরক্ষিত একটা কামরা এবং ওয়াশিংটনে যোগাযোগের যাকিছু ব্যবস্থা আমি ইতিমধ্যেই সেরে রাখবো। আজ রাতে অফিস ছেড়ে যাবার আগেই আমি তালিকার প্রত্যেকটি নামের যাকিছু নথিপত্র সব সংগ্রহ করে রাখবো। তুমি শুধু নামগুলো মনে রাখবে এবং সেই মুহূর্তটার জন্যে অন্য আর সবকিছু ভুলে যাবে। তার চেয়েও বড় কথা—একটুও দুশ্চিন্তা করবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী কাল রাত থেকেই তুমি এ শহরের সবার সম্মান আর প্রশংসা কুড়বে।'

এমন উষ্ণ আর আন্তরিক ভঙ্গিমায় জ্যাক হেণ্ডারসন কথাগুলো বললেন যে ক্রেন প্রতিরোধ তো দূরের কথা, মনে মনে কবোষ্ণ আর রক্তিম একটা আত্মপ্রত্যয় অনুভব না করে পারলো না। তার জীবনের সবচেয়ে জটিল আর আতঙ্কজনক এই যে সঙ্কট, তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে

করতেই প্রায় সারাটা দিন কেটে গেছে, তাই 'হেণ্ডারসন, হক বেইলি অ্যাণ্ড কোহেন' ছেড়ে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে নিজেকে তার অনেকটা হালকা আর প্রসন্ন বলে মনে হলো। বাড়ি ফিরে আসার পথে তার এই প্রসন্নতা এমন একটা করুণ সমবেদনার রূপ নিলো যে তার ঘর পর্যন্ত ধাওয়া করে এসে পরওয়ানা দিয়ে যাওয়া লোকটাকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপককে যে কড়া তিরস্কার করবে বলে পরিকল্পনা করেছিলেন, তা না করারই সিদ্ধান্ত নিলো। মনে মনে ভাবলো, 'আর কিছু না হোক, প্রত্যেকেরই নিজের নিজের কাজ করে যাওয়ার অধিকার আছে। আমার মতো সেও হয়তো নিজের দেশের স্বার্থের কথা ভাবে। তার ধারণা, দুহাতে দুটো বোমা লুকিয়ে রাখা আমি হয়তো কোনো বলশেভিক।'

একই সঙ্গে, কোনো কারণ না জানিয়ে আজ দুপুরে সে যে ভাবে খাওয়ার পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভেঙে দিয়েছে, তার জন্যে ম্যাডালিন ব্রিগেস-এর প্রতি সচেতন ভাবেই তীব্র একটা বেদনা অনুভব না করে পারলো না। ও যে শুধু তার অভিনয়ের প্রধান আকর্ষণ তাই নয়, অমন আশ্চর্য রূপসী তরুণী এর আগে সে কখনও দেখেনি। ওর সঙ্গে তার সম্পর্কটা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে যে ওর যথেষ্ট অধিকার আছে তার কাছ থেকে কিছুটা দায়িত্ববোধ আশা করার। মেয়েদের প্রতি সরাসরি এবং শোভন আচরণে সে বরাবর নিজেও গর্বিত। মনের মধ্যে এইসব ভাবনাকে সামনে রেখেই সে কুমারী ব্রিগেসকে ফোন করলো এবং অভিনয়ের আগে সান্ধ্যভোজে তার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করলো।

'না না, আমি রাগ করিনি,' মিষ্টি সুরেলা গলায় ম্যাডালিন অন্য প্রান্ত থেকে জবাব দিলো। 'এমন কি, বিশ্বাস করো, আমি কিছু মনেও করিনি। আমি জানি হার্ভে, নিশ্চয়ই তোমার কোনো জরুরী কাজ — এখন সব ঠিক হয়ে গ্যাছে তো?'

'হ্যাঁ, প্রায়।'

'কিন্তু, সোনামণি, সান্ধ্যভোজের জন্যে আমি যে ইতিমধ্যেই কথা

দিয়ে ফেলেছি। রাগ কোরো না, লক্ষীটি। সত্যি বলতে কি, তুমি যদি আমাদের সঙ্গে যোগ দাও, সত্যিই খুব খুশি হবো। দোহাই তোমার—না কোরো না। দেখো, তোমার একটুও খারাপ লাগবে না। বরং আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, উনি তোমাকে দেখে সত্যিই খুব খুশি হবেন। ভদ্রলোক তো তোমার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। বললেন বহু বছর ধরে তোমাকে চেনেন এবং তুমিও নাকি ওঁকে দেখলে অবাক না হয়ে পারবে না।'

'কে বলো তো ভদ্রলোক ?'

'প্যাট ম্যাকিনটস।'

'ও, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক ?'

'হ্যাঁ, ভদ্রলোক কিন্তু সত্যিই খুব শোভন, হার্ভে। তুমি ঠিক জানো কি না আমি জানি না, উনিই আমাকে প্রথম চাকরিটা দিয়েছিলেন! তাহলে 'সাদি'-তে তুমি আসছো তো ?'

প্রথমে ক্রেন ইতস্তত করলো, কেননা তার সহজাত প্রবৃত্তি যেন ভেতর থেকে 'না' বলতে চাইলো, কিন্তু অন্যদিকে আবার ম্যাডালিনকে দেখার তীব্র বাসনা তাকে পেয়ে বসলো, ঠিক যেমন দুপুরে দেখতে চেয়েছিলো জেনকে। তাই মুহূর্তের জন্যে চুপ করে থেকে সে ভাবলো—'কেন নয় ? হয়তো সামাজিকভাবে সেই বৃদ্ধ মানুষটার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। তাহলে কেন আমি তাঁকে দেখাবো না যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোনো আক্রোশ নেই, এই সৌজন্য-বোধই আমাদের দুজনের চাইতেও অনেক বড় ?' শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে সে ম্যাডালিনকে বললো, 'নিশ্চয়ই যাবো, সোনামণি। তবে তোমরা দুজনেই হবে আমার অতিথি। তাহলে ওই কথাই রইলো—ঠিক সাতটায়।'

'হ্যাঁ। এবং তখন তুমি আজকের অসুবিধের কথা আমাকে বলবে।'

'তখন নয়, লক্ষীসোনা,' মন গলানো সুরে ক্রেন বললো, 'অভিনয়ের

পর যখন আমরা দুজন ছাড়া কেউ থাকবে না, তখন। আমার কাছে তোমার মূল্য কতখানি, তুমি কি জানো সোনামণি?'

একই রহস্যময় ভঙ্গিতে ম্যাডালিন ফিসফিসিয়ে বললো, 'এখন বলবো না, পরে।'

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখার মুহূর্তে ক্রেনের মুখে ফুটে উঠলো সমবেদনার প্রচ্ছন্ন একটা হাসি। সমস্ত সত্তা জুড়ে পরিব্যাপ্ত কবোষ্ণতা-টুকুকে সে স্পষ্টই অনুভব করতে পারলো। মনে মনে ভাবলো, কোনো ইপ্সিত নারী একজন পুরুষকে যতটা সচেতন করে তুলতে পারে তেমনটা আর কোনো কিছুই পারে না—না দুঃখ, না বিপদ, না কোনো বেদনাও। আজকে দিনে তার এই ভূমিকা সবাই যেমন বুঝতে পারবে না, ঠিক তেমনিভাবে অবমাননা আর নীচতার মধ্যে দিয়ে কাজ করে যাওয়ার সুযোগও হয়তো সবার নেই। কিছুটা আত্ম-সচেতন ভাবেই সে মনে মনে 'হার্ভে ক্রেন নামক আমেরিকান লোকটা'র কথা ভাবতে লাগলো।

কোকা কোলা সম্পর্কে নানান কথা বলা হয়, অনেকের কাছে ওটা এক ধরনের মৃদু পানীয়ের চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এবং পৃথিবীতে এমন বহু জায়গা আছে যেখানে 'কোকা কোলা সভ্যতা' শব্দটাকে নির্দ্বিধায় উল্লেখ করা হয়। সে যাই হোক, তবে এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব একটা অনুভূতি আছে, বিশেষ করে যখনই আরবে আমার 'দুঃসাহসিক অভিযান'-এর কথাটা মনে পড়ে যায়।

এ পৃথিবীতে সবচেয়ে উপেক্ষিত যেসব অঞ্চল, আরব তাদেরই অন্যতম এবং সেই আরবীয় রোমান্সের প্রতি তেমন মোহ আমার কোনো কালেই ছিলো না, অন্তত গ্রীষ্ম কালে তো নয়ই। জুন মাসে জায়গাটা নরকের চাইতেও গরম। আমি জানি, সচতুর কল্পনায় নরকের জন্ম হলেও, আরবীয় গ্রীষ্ম কিন্তু বাস্তবে সত্যি। কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্রীষ্মকালে আমাকে একবার আরবে যেতে হয়েছিলো। আফ্রিকা থেকে সুদূর প্রাচ্য পরিভ্রমণের সময় কৌতূহল বশেই আরবীয় উপদ্বীপ অঞ্চলে কি ঘটছে দেখার জন্যে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। শীতকাল হলে অন্যদের মতো আমিও হয়তো আরব সম্পর্কে কোমল আগ্রহ অনুভব করতাম। কিন্তু কয়েকদিনের প্রচণ্ড উত্তাপ, জ্বলন্ত বালি আর অবর্ণনীয় দারিদ্র আমার সেই কৌতূহলকে নিবৃত্ত করতে পেরেছিলো, আরব থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে আমি ছটফট করছিলাম।

প্রথমে যতটা সহজ মনে হয়েছিলো, আসলে কিন্তু ততটা সহজ নয়। কেননা সৈন্য-বিমান চলাচলের জন্যে কয়েকটা বিমান অবতরণ-ক্ষেত্র থাকলেও, আরব থেকে সরাসরি বেরুবার অন্য কোনো উপায় ছিলো না। আর ওইসব বিমান অবতরণ-ক্ষেত্রের প্রায় সবকটিতেই অল্প কয়েকজন আমেরিকান সৈন্য অবিরাম জলশূন্যতার প্রচণ্ড দুরবস্থার মধ্যে থাকার

ফলে, মেয়েমানুষ বা যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো কথা না বলে, অন্য বিমান অবতরণ-ক্ষেত্রে জলের গুণাগুণ, স্বাদ আর পরিমাণ সম্পর্কেই বেশি বলে। এবং জল সম্পর্কিত গভীর আলোচনার ফাঁকে ফাঁকেই তাদের যাকিছু সঞ্চয় খরচ করে ফ্যালে কোকা কোলার পেছনে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার—আরবীয় মরুভূমিতে একজন আমেরিকান যে কতগুলো কোকা কোলা পান করতে পারে, সে সম্পর্কে কারুর কোনো ধারণাই নেই।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া আরও বেশি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং একদিন আমি যখন উপদ্বীপের কেন্দ্র অঞ্চলের কোনো একটা বিমান অবতরণ-ক্ষেত্রে নামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টলতে টলতে এগিয়ে চললাম ছায়াঘন আস্তানাটার দিকে। তাপমান যন্ত্রে দেখলাম একশো ষাট ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তাপ। তখনই বুঝলাম আরবে থাকার সাধ আমার ঘুচে গেছে। পরবর্তী বিমানটা কখন ছাড়বে আমি তারই খোঁজ করতে লাগলাম।

জানতে পারলাম, আটচল্লিশ ঘণ্টা অন্তর অন্তর কেবল একটাই মাত্র বিমান ছাড়ে—সেটা হচ্ছে সি. ফর্টিসিক্স, একটি মালবাহী বিমান। নির্দিষ্ট সময় অনুসারে আজই বিকেলে তেল আর মালপত্র ভরে নেওয়ার পর ছাড়বে। সাদা বালির জ্বলন্ত মরুভূমির মধ্যে, ঈশ্বর পরিত্যক্ত এমন একটা জায়গা থেকে কি ধরনের মালপত্র বোঝাই হতে পারে—আমি যেমন জানি না, তেমনি সি. ফর্টিসিক্স বিমানটা কোথায় যাবে তাও আমি জানতে চাই না। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শুধু এইটুকু বুঝতে পারলাম, বিমানটা যেখানেই যাক না কেন, এখন যেখানে রয়েছি তার চাইতে জায়গাটা নিঃসন্দেহে ভালো হবে।

সি. ফর্টিসিক্স বিমানটা এসে পৌঁছতে তখনও তিনঘণ্টা বাকি। এই তিনঘণ্টা আমি ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া মানুষের মতো কেবলই বিস্বাদ হলদে জল পান করতে লাগলাম, সল্ট ট্যাবলেট গিললাম আর এখানে ওখানে যত পদস্থ কর্মচারী এবং কোকা কোলার প্রতিনিধির

সঙ্গে গল্প-গুজব করে বেড়ালাম। ওরা সবাই আমার দিকে এমন ভাবে তাকাতে লাগলো যেন আমি মৃত্যু-উপত্যকার স্থায়ী কোনো বাসিন্দা— অবশ্য মৃত্যু-উপত্যকা বলতে যদি সত্যিই কোথাও কিছু থেকে থাকে— কেননা ওরা বরাবরই ভ্রমণকারীদের বাতানুকূল মোটরের মধ্যেই দেখতে অভ্যস্ত, বিশেষ করে কেউ কেউ যখন আবার কোকা কোলার বোতলের ওপরেই বসে থাকে। এখানকার বাসিন্দাদের জীবন-স্ফুলিঙ্গ তখনই উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে যখন তারা যে যার নিজেদের অঞ্চলের গরমের কথা সদম্ভে ঘোষনা করে। তবে এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে পৃথিবীর যেকোনো জায়গার চাইতে এখানকার গরম আরও বেশি, আরও মারাত্মক।

'আবাদানেও খুব গরম।' স্রেফ আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্যেই আমি মন্তব্য করলাম, কেননা আমেরিকান সৈন্য থাকার জন্যেই সম্ভবত আবাদান খুব পরিচিত ও বহু আলোচিত একটা জায়গা, যেটা 'পৃথিবীর দ্বিতীয় উষ্ণতম' স্থান হিসেবে চিহ্নিত।

'আবাদান!' বিষণ্ণ ভাবে ওরা মাথা নাড়লো। 'আবাদানে কিন্তু সত্যিকারের গরম নেই। আমরা তো ওখানে ছুটি কাটাতে যাই এবং যখন ওদের ওখানকার গরমের কথা বলি, ওরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। ওদের ধারণা আমরাই ওদের জায়গাটার গুরুত্ব নষ্ট করে দিচ্ছি।'

এমন সময় বিমানটা অবতরণ করলো। নিজেকে আমার মনে হলো সাজা-পাওয়া কোনো মানুষের মতো, অলৌকিক ভাবে যে এই সবে মুক্তির আদেশ পেয়েছে। আমি ধীরে ধীরে গাড়ি-বারান্দার নিচে এসে দাঁড়ালাম এবং সি. ফর্টিসিক্স-এর কর্মীবৃন্দদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম, যারা তখন শানবাঁধানো জ্বলন্ত পথ অতিক্রম করে এদিকেই এগিয়ে আসছে। সংখ্যায় ওরা তিনজন, বয়েস খুবই অল্প, উচ্ছল হাসি-খুশিতে ভরা সুন্দর স্বাস্থ্য, গাঢ় নীল চোখ, অবাধ হাসিতে প্রসন্ন মুখ।

সৌজন্য বিনিময়ের পর আমি ওদের জানলাম, 'আচ্ছা, ফেরার সময় আপনারা কি একজন যাত্রীকে নিতে পারেন?'

'নিশ্চয়ই,' বিমান চালকই জবাব দিলো। 'অবশ্য সঙ্গে যদি ছাড়পত্র থাকে।'

'সেদিক থেকে আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না। যাত্রী হিসেবে আমি যেতে চাই।'

'বাঃ, খুব ভালো। যাত্রী আমরা সত্যিই পছন্দ করি। মরুভূমির মধ্যে দিয়ে দিনরাত কেবল মাল বয়ে নিয়ে যাওয়া আর নিয়ে আসা··· বৈচিত্র্যের কোনো বালাই-ই নেই, এত একঘেয়ে লাগে! আপনি তো সামরিক-সংবাদদাতা, তাই না স্যার? তাহলে আপনার জীবনে নিশ্চয়ই অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটেছে!'

আমি অকপটেই স্বীকার করলাম, 'তা সত্যি। তবে এখান থেকে বিদায় নেওয়ার চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা আর কখনও ঘটেনি।'

'সত্যিই খুব ভালো হবে। মাল ভরতে আমাদের সামান্য কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে, তারপরেই আমরা ছেড়ে দেবো। আপনি কোথায় যাবেন?'

'আপনারা যেখানে যাবেন।' আমি আবার অবাক হয়ে ভাবলাম এ রকম একটা জায়গা থেকে কি ধরনের মাল নিয়ে যাওয়া সম্ভব। যাই হোক, শিগগিরই বুঝতে পারলাম—প্রথম থেকেই মনে মনে যা অনুমান করেছিলাম, সেটাই ঠিক। পরিত্যক্ত এই অবতরণ-ক্ষেত্র থেকে কেবল সেই ধরনেরই মাল যাওয়া-আসা সম্ভব যা এই ঊষর ভূমিতে সুপ্রচুর পরিমানে ব্যবহার করা হয়। ঘামে-ভেজা একসারি আমেরিকান সৈন্য কোকা কোলার খালি বোতলের বাক্সগুলো ততক্ষণে বিমানের খোলের মধ্যে ভরতে শুরু করে দিয়েছে।

দু ইঞ্জিনের সি. ফর্টিসিক্স বিমানটা বিশাল, বিশ্রী দেখতে, প্রকাণ্ড একটা তিমির মতো ঝোলা-পেট। বিমানটা যে মাল বওয়ার জন্যেই বিশেষভাবে তৈরি সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। এই ধরনের বিমানে আমি বহুবার চড়েছি, এদের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই—শুধু এইটুকু জানি, কর্ণকুহর বিদীর্ণ-করা ভয়ঙ্কর শব্দ আর অবতরণের মুহূর্তে ল্যাণ্ডিং

গিয়ারটা যখন নামিয়ে দেওয়া, সেই সময় শিরা-উপশিরা পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলা প্রচণ্ড ঝাঁকুনির জন্যে বিমান-চালকরা ওগুলোকে ঠিক পছন্দ করে না। কিন্তু যেহেতু সব বিমানই আমার কাছে সমানভাবে অনিশ্চিত, তাই ঝলসে যাওয়া আমার দেহ-মনকে উদ্ধার করতে আসা এই বিমানটির প্রতি আমি বিশেষ এক ধরনের কৃতজ্ঞতা বোধ অনুভব না করে পারলাম না।

এই বিমানটার আবার কোনো দরজা নেই। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় যেসব সি. ফর্টিসিক্স বিমান চলাচল করে তাদের দরজা আবার এত বড় যে কোনো জীপ বা ছোটখাটো কামান অনায়াসেই ঢোকানো যায়। কিন্তু কেন জানি না, এটার দরজাগুলো দেখছি কোথাও উধাও হয়ে গেছে। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে এমন একটা বিমানে চড়ার কোনো অর্থই হয় না, তবে এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো মানসিকতাও আমার তখন ছিলো না। কোকা কোলার ছোট ছোট বাক্সে বিমানটা তখন কিভাবে ভরে উঠেছে, অত্যন্ত মনযোগের সঙ্গে আমি শুধু সেটাই লক্ষ্য করছি। একটা খালি সি. ফর্টিসিক্স বিমানেতে কে কতগুলো কোকা কোলার বোতল ভরতে পারে সেটা যেমন উল্লেখযোগ্য, আমার মনে হলো তার চাইতে অনেক অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য এক একটা বিমান অবতরণ-ক্ষেত্র কতগুলো কোকা কোলার বোতল খরচ করতে পারে। আমি বারবার সুনিশ্চিত হয়ে উঠতে লাগলাম যে এভাবে চলতে পারে না, সি. ফর্টিসিক্সটায় আর একটাও কোকা ,কোলার বাক্স ধরবে না, এবার উপছে পড়বে। কিন্তু শিগগিরই আবিষ্কার করতে শুরু করলাম যে ওই দু ধরনেরই ধারণ-ক্ষমতা আমার কল্পনার বাইরে। কেননা প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে, জ্বলন্ত সূর্যের নিচে অবিরাম ধারায় খালি কোকা কোলার বোতল কেবলই পরিপূর্ণ হয়ে যেতে লাগলো। লক্ষ্য করলাম, এই যে ভয়াবহ উত্তাপ এতে আমি যেন ক্রমশই অদৃষ্টবাদী হয়ে উঠছি আর বোতলের বাক্সে যেভাবে বিমানের পেটটা ভরে উঠছে, তাতে কল্পনাপ্রবণ না হয়ে উঠে আমার কোনো উপায় নেই। ভারাক্রান্ত মন

নিয়েই দেখলাম বিমানকর্মীরা কোকা কোলা বোতল আর বিমানের দেওয়ালের মাঝখানে সংকীর্ণ একফালি একটু জায়গা রেখে দিয়েছে, নইলে একজনও যাত্রী বসার কোথাও কোনো জায়গা নেই।

অবশেষে সব কাজ যখন মিটলো, বিমানকর্মীদের মধ্যে যে সবচেয়ে তরুণ, খুব বেশি হলে বছর আঠেরো বয়েস, সবে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে, সহযোগী সেই ছেলেটি এসে আমায় খবর দিলো সব প্রস্তুত, এখুনি ওরা রওনা হবে। বিমানের দিকে হেঁটে যাবার সময় আমি তাকে জিগেস করলাম কোথায় বসলে তাদের সুবিধে হবে।

'যেখানে খুশি আপনি স্বস্তিতে বসতে পারেন,' উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার ভঙ্গিতে ছেলেটি বললো। 'আপনাকে পেয়ে সত্যিই আমরা খুব খুশি হয়েছি। কেননা আপনার মতো কোনো মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া রীতি-মতো একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার।'

সেখানে খুশি বলতে কোকা কোলার বাক্স আর বিমানের দেওয়ালের মাঝখানে আঠারো ইঞ্চি পরিমান একফালি অংশ। সুতরাং হাঁ-মুখ দরজা থেকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আমি একটা জায়গা বেছে নিলাম। বর্ষাতিটা মেঝের ওপর বিছিয়ে নিজেকে টানটান করে মেলে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন পাঁচ হাজার ফুট ওপরের ঠাণ্ডা, ঝিরঝিরে মিষ্টি একটা বাতাস বইবে। যেখানে আমি শুয়ে রয়েছি, সেখান থেকে যেখানে একসময় দরজা ছিলো তার ফাঁক দিয়ে সামনের সবকিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আগ্রহ ভরে লক্ষ্য করলাম ধাবনপথ ধরে ছুটতে ছুটতে একসময়ে আমরা বাতাসে ভর করে উড়তে শুরু করেছি। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখলাম বিমান-ক্ষেত্রটা অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে, কিন্তু যে ঝিরঝিরে মিষ্টি বাতাসটা বইবে বলে আশা করেছিলাম, তার কোথাও কোনো পাত্তা নেই। আমরা তখন মাত্র পাঁচ ছশো ফুট ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি এবং কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করছি। বিমান অবতরণ-ক্ষেত্রটা যেখানে ছিলো, সেখানকার লবণের মতো সাদা বালির বিস্তীর্ণ অঞ্চল পেরিয়ে এখন আমরা ক্রমশ ঢালু হয়ে মিশে যাওয়া বালির

উঁচু-উঁচু পাহাড়গুলোর ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি। কখনও কখনও মনে হচ্ছে মাত্র আর কয়েক ইঞ্চির জন্যে বিমানটা বালির পাহাড়ের চূড়া-গুলোকে স্পর্শ করলো না।

সহযোগী ছেলেটি এক সময় নিয়ন্ত্রণ-খুপরি ছেড়ে দেওয়ালের গা ঘেঁষে আমার কাছে এসে পৌঁছলো।

'আপনি শুনলে হয়তো হাসবেন, স্যার,' তার প্রাণচঞ্চল সেই খুশিতে চলকে ওঠা সুরে ছেলেটি বললো, 'ভারসাম্যতার ব্যাপারে বিমানটার কোথায় কি যেন একটা গোলমাল হয়েছে।'

'কিসের ব্যাপারে?' অবাক হয়েই আমি প্রশ্ন করলাম।

'ভারসাম্যতার ব্যাপারে। আপনি তো নিজে চোখেই দেখলেন স্যার, বিমানটাকে কি ভাবে ভর্তি করা হলো। সি. ফর্টিসিক্স বিমান কিন্তু শুধু সৈন্যবাহিনীর মালপত্তর, যেমন—সাঁজোয়া, জীপ, পঞ্চাশ মিলিমিটারের কামান কিংবা ওই ধরনের জিনিসপত্তর বওয়ার জন্যে, কোকা কোলা বওয়ার জন্যে নয়।'

স্বীকার করলাম, 'হ্যাঁ, আমারও তাই ধরণা ছিলো।'

'নিশ্চয়ই! কিন্তু কে ওদের বোঝাবে বলুন। তবু যদি একটু বুঝে শুনে ভর্তি করতো, তাহলেও না হয় কথা ছিলো। খালি হওয়া সত্ত্বেও ওগুলো যে কত ভারি আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না! খাড়া ভাবে আমরা কিছুতেই ওপরে উঠতে পারছি না, ভারসাম্যতার ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোথাও কোনো গোলমাল হয়েছে। তাই চালকের ধারণা আপনি যদি আমার সঙ্গে একটু কষ্ট করে বিমানের লেজের দিকে চলে আসেন তাহলে হয়তো কিছুটা সুবিধে হতে পারে, হয়তো তখন আমরা আরও খানিকটা ওপরে উঠতে পারবো।'

খোলা দরজা দিয়ে আমি বালির পাহাড়গুলোর দিকে তাকালাম, তারপর আপন মনে মাথা নাড়তে নাড়তে বোকার মতোই জানতে চাইলাম, 'আপনাদের প্যারাশুট নেই?'

'না, স্যার।'

'ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো। অবশ্য যদিও এটা নিয়ম বিরুদ্ধ, তবু এত অল্প উচ্চতায় প্যারাশুট কোনো কাজেই লাগবে না···বাতাসে না খুলে হয়তো দরজার কাছেই জড়িয়ে যাবে।'

গুঁড়ি মেরে লেজের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় দুর্মর বাসনা হলো ছেলেটাকে একবার জিগেস করি দরজাগুলোর কি হলো—ওরা ইচ্ছে করেই দরজাগুলোকে সরিয়ে ফেলেছে, না কি ওগুলো আপনা থেকেই খুলে কোথাও পড়ে গেছে, যেগুলোকে খুঁজে বার করার আর কোনো প্রয়োজনই হয়নি। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও জিগেস করতে পারিনি এবং উধাও হয়ে যাওয়া দরজার রহস্য আজও আমার কাছে অমীমাংসিতই থেকে গেছে। যাই হোক, গুঁড়ি মেরে আমরা বেশ খানিকটা দূরে, প্রায় লেজের কাছাকাছি জায়গায় পৌঁছে গেলাম এবং যেখানে কোকা কোলার বাক্সের পাহাড় জমে উঠেছে তার মধ্যে কোনো রকমে গুটিসুটি হয়ে বসলাম। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ভারসাম্যতার কোথাও কোনো পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হলো না। সারসের মতো গলা বাড়িয়ে সহযোগী ছেলেটি স্বীকার করলো আমরা আগের চেয়ে একটুও ওপরে উঠতে পারিনি।

'মনে হয় আমাদের দুজনেরই বোধ হয় নিয়ন্ত্রণ-কুঠরির দিকে যাওয়া ভালো,' ছেলেটি বললো। 'বলা যায় না, হয়তো সামনের দিকেই ওজনের দরকার বেশি।'

আমরা আবার সন্তর্পনে নিয়ন্ত্রণ-কুঠরিতে ফিরে এসে চালক ও সহকারী বিমান চালকের সঙ্গে যোগ দিলাম। ওরা দুজনে সেই ধরনের তরুণ, যারা কোনো কিছুকে তোয়াক্কা করে না। অবশ্য উদ্বিগ্নতার অস্পষ্ট একটা অলৌকিক আভা আলতো করে জড়িয়ে রয়েছে ওদের চোখে মুখে। তবে আমার ব্যক্তিগত ধারণা, ওদের চোখে মুখের সেই অলৌকিক আভা যতটা অস্পষ্ট বা আলতো মনে হচ্ছে হয়তো ব্যাপারটা তার চাইতে আরও গভীর।

'কি যে হয়েছে কিছু বুঝতে পারছি না।' চালকই প্রথম বললো।

'আসলে আমরা উপযুক্ত উচ্চতায় পৌঁছতে পারছি না।' সহকারী চালক ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার করে বোঝানোর চেষ্টা করলো।

'ভারসাম্যতার জন্যেই এ রকম হচ্ছে।' সহযোগী ছেলেটি মন্তব্য করলো।

'আমার মনে হয়,' ভেতরের চাপা অস্বস্তিটাকে আমি কিছুতেই প্রকাশ না করে পারলাম না, 'অলুক্ষণে ওই কোকা কোলার বোতলগুলোর জন্যেই এই কাণ্ডটা ঘটেছে। এতগুলো বোতল বওয়ার মতো কোনো বিমানই আজ পর্যন্ত তৈরি হয় নি।'

'ওগুলো খালি, স্যার।' মৃদুভাবে চালকই জবাব দিলো।

'কিন্তু বিমানটা খালি নয়। বরং সম্পূর্ণ ভাবেই ঠাসা।'

'হ্যাঁ; তা ঠিক। তবে খালি বোতলের ওজন আমরা হিসেব করে দেখেছি, তাতে বইতে না পারার কোনো কারণ নেই।'

'ওজন নয়, ভারসাম্যতার জন্যেই এই অসুবিধে হচ্ছে।' ছোকরা নিজের জেদ বজায় রাখার চেষ্টা করলো।

'সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে—সি. ফর্টিসিক্স বিমান আসলে কোকা কোলার বোতল বওয়ার জন্যে নয়। আশা করি আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।' সহকারী বিমান চালক কেমন যেন ম্লান স্বরেই বললো।

'কিন্তু তার চাইতেও যা বেদনাদায়ক,' আমি না বলে পারলাম না, 'আগে কিংবা পরে ওইসব জঘন্য বালির পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে আমাদের মুখ থুবড়ে পড়তে হবে।'

'ওগুলো পাহাড় নয় স্যার, নিতান্তই বালিয়াড়ি।'

'দেখে তো পাহাড় বলেই মনে হচ্ছে।…এবং আমরা যদি আরও ওপরে উঠতে না পারি তাহলে নির্ঘাত ওগুলোর কোনো না কোনো একটাতে ধাক্কা খেতেই হবে।'

'সত্যিই খুব ঝামেলায় পড়া গেলো দেখছি।'

'ঝামেলার চাইতে আরও কদর্য ব্যাপার হবে যদি এই মরুভূমির

মাঝমধ্যিখানে আমাদের নামতে হয়। আমার মনে হয় ঘুরিয়ে নিয়ে বিমান অবতরণ-ক্ষেত্রে ফিরে যাওয়াই ভালো।'

'আমরাও সে কথা ভেবেছি, স্যার। কিন্তু যেহেতু বেশি উঁচুতে ওঠার ক্ষমতা হারিয়ে আমরা এখন দুটো ঢালুর মাঝের মিলিত একটা প্রান্তরেখা ধরে এগিয়ে চলেছি, তাই এখন আর বিমান অবতরণ-ক্ষেত্রে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।'

একদিক থেকে মনে মনে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। তবু মুখে বললাম, 'বেশ, যা ভালো বোঝেন করুন। কিন্তু আমার মনে হয় এখনও একটা উপায় আছে।'

'কি বলুন তো?'

'কিছু কোকা কোলার বোতলের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া।'

'কিন্তু কিভাবে সম্ভব, আমি সেটাই বুঝতে পারছি না।' বিস্ময় ভরা নীল চোখদুটো মেলে দিয়ে সহকারী চালক আমার মুখের দিকে তাকালো।

'ফেলে দিয়ে,' আমি বেশ জোর দিয়েই শব্দগুলো উচ্চারণ করলাম। 'খোলা দরজা দিয়ে সোজা টান মেরে ওগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিন। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না উঁচুতে ওঠার মতো বিমানটা একটু হালকা হচ্ছে, ওই ভাবে সমানে ছুঁড়ে ফেলতে থাকুন।'

'কোকা কোলার বোতলগুলো, স্যার?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—আমি কোকা কোলার ওই খালি বোতলগুলোর কথাই বলছি।'

'মানে, আপনি ওগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'ও, না; তা হয় না!' চালক অস্ফুটে প্রতিবাদ জানালো।

'আসলে আমরা তা করতে পারি না, স্যার।' কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতেই সহকারী বিমান চালক কথাগুলো বললো।

'কোকা কোলার বোতল ছাড়া অন্য কিছু হলে হয়তো ভাবা যেতো,'

সহযোগী তরুণটি বিজ্ঞের মতো একটা গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুললো। 'পরিস্থিতি তেমন হলে জীপ, সাঁজোয়া, কামান ফেলে দিতেও আমরা এতটুকু দ্বিধা করতাম না। কিন্তু কোকা কোলার বোতল ফেলে দেওয়া কোনো মতেই সম্ভব নয়। আমার মনে হয় কোকা কোলার ব্যাপারটা আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না।'

'আসলে, কোকা কোলা হচ্ছে···আপনাকে ঠিক কিভাবে বোঝাবো আমি নিজেই বুঝতে পারছি না।' চালক যে বিব্রত বোধ করছে সেটা ওর মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা গেলো। 'জীবন সম্পর্কে আপনার বহু অভিজ্ঞতা আছে, হয়তো আপনিই কিছুটা অনুমান করতে পারবেন···'

'শুল্ক বিভাগের চালানের সঙ্গে আমাদের মালের হিসেব মিলবে না।' সহযোগী ছেলেটিই চটপট জবাব দিলো। 'ওরা যদি জিগেস করে কম পড়া বোতগুলো কি হলো? আমরা যদি বলি যে আরব মরুভূমিতে ওগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি···উঃ, তখন যে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটবে, সে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

'কিন্তু আমি নিজে যদি সমস্ত দায়িত্ব নিই?' আমি ওদের মিনতি করলাম। 'ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমার হাতে ছেড়ে দিন। কোকা কোলা কোম্পানী এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে আমি একা দায়ী থাকবো। এমন কি বোতলের জন্যে যাকিছু ক্ষতিপূরণ দিতেও আমি রাজি আছি।'

'তা হয় না, স্যার—এতবড় একটা দায়িত্ব আপনি একা নিতে পারেন না।'

শেষ খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো মরিয়া হয়েই আমি বললাম, 'পদমর্যাদায় আমি আপনাদের সবার ওপরে। এই দেখুন আমার পরিচয়-পত্র। ধরুন আমিই আপনাদের আদেশ করছি···'

'না, আপনি তা পারেন না, স্যার।' কেমন যেন করুণ হয়ে উঠলো চালকের কণ্ঠস্বর। 'প্রকৃতপক্ষে একজন সংবাদদাতা হিসেবে আপনি আমাদের পদমর্যাদাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন না। আমার ধারণা, আমাদের এ ধরনের আদেশ দেবার অধিকারও আপনার নেই।'

'কিন্তু আগে কিংবা পরে, যখনই হোক—বালির ওই পাহাড়গুলোর একটাতে ধাক্কা আমাদের খেতেই হবে। তখন আরব মরুভূমির মাঝ-মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ কি আপনি জানে না? তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরার কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু একথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আরবরা আমেরিকানদের একটুও পছন্দ করে না। ওরা যদি আমাদের খুঁজে পায়, তখন অবস্থাটা কি ঘটবে আশা করি আপনি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন?'

'হ্যাঁ স্যার, আপনি যা বলছেন সবই সত্যি।' চালক সসঙ্কোচেই স্বীকার করলো। 'এ রকম একটা কুৎসিত পরিস্থিতির জন্যে আমার নিজেরই লজ্জা করছে। কিন্তু কি করবো আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। এখন কেবল একটাই মাত্র সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি, তা হলো সামনে যে বিমান অবতরণ-ক্ষেত্রটা পড়বে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বলা যে মাল খালাস করার জন্যে আমরা পৌঁছচ্ছি। ওটা এখান থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে। এবং এই দূরত্বের মধ্যে বালিয়াড়ির ঢালের প্রান্তরেখাটা খুব একটা খারাপ নয়। এই একটাই মাত্র সুযোগ যা আমরা গ্রহণ করতে পারি।'

ওদের ঔদ্ধত্যের কাছে বিনীত আবেদন জানিয়ে বললাম যে বালি আর কোকা কোলার বোতলের মাঝখানে প্রত্যঙ্গের মতো এভাবে থেঁতলিয়ে মরাটা আদৌ কোনো গৌরবের ব্যাপার নয়। তাছাড়া, আমার জানা বা পড়া, তৃষ্ণার জল না পেয়ে মরুভূমির মধ্যে ছটফটিয়ে মরা ভয়ঙ্কর সব করুণ দৃশ্য এবং আমেরিকানদের বিরুদ্ধে আরবদের নিষ্ঠুর নৃশংসতার স্পষ্ট ছবিও ওদের সামনে তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম।

কিন্তু এ সবে কোনো ফলই হলো না, কেননা কোকা কোলার সমস্ত বোতলগুলোকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ওরা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

পরবর্তী কুড়িটা মিনিট নিদারুণ এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে

কেটে গেলো। অবশেষে, দূরের জ্বলন্ত অস্পষ্টতায় যখন বিমান অবতরণ-ক্ষেত্রটাকে আবছা দেখা গেলো, মনে হলো আমার জীবনে সেটা যেন একটা অবিস্মরণীয় শুভ মুহূর্ত। আমরা যত এগিয়ে চলেছি, উচ্চতা ততই কমে আসছে। মাটি থেকে আমরা তখন হয়তো এক হাজার ফুটের একটুও ওপরে নয়। সমস্ত ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য দ্রুত, বলতে গেলে এক রকম চোখের পলকেই ঘটে গেলো। কি যেন একটা নেই, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা আমাদের সেই মুহূর্তের অস্তিত্বে একটা চূড়ান্ত রূপ নিলো। যেটা নেই, তা আমার প্রতিটা শিরা-উপশিরা, আমার স্মৃতি, আমার সমস্ত সচেতনতাকে শিকারী থাবায় শক্ত করে আঁকড়ে ধরলো, আর আতঙ্কের হিমেল একটা স্রোত সারা শরীরে বয়ে যেতেই আমি বুঝতে পারলাম নিরুদ্দিষ্ট যে জিনিসটা নেই, তা হলো ল্যাণ্ডিং গিয়ারটা নামাবার সময় কর্ণকুহর বিদারক সেই প্রচণ্ড সংঘর্ষের শব্দ। অর্থাৎ চাকা ছাড়াই আমারা মাটি স্পর্শ করতে যাচ্ছি!

হঠাৎ পাগলের মতো আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'চাকা···বিমানের নিচে চাকা নেই···'

শব্দগুলো যতটা সম্ভব জোরে আর অসম্ভব দ্রুতই বলার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমরা ইতিমধ্যেই শানবাঁধানো ধাবন-পথ ধরে দ্রুত ছুটে চলেছি···একসময়ে তিমির মতো বিশাল পেট আর ধাবন-পথটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে, খালি কোকা কোলার বোতলের গায়ে বোতল ঠোকার সম্মিলিত স্বরলহরীর মাঝেই বিমানটা হঠাৎ থমকে গেলো। আমরা বেশ ভালো ভাবেই অবতরণ করলাম। পরে শুনেছিলাম, চাকা থাকলেও আমরা বোধহয় এর চাইতে সুন্দর ভাবে অবতরণ করতে পারতাম না, অবশ্য তখন বিমানের নিচের অংশটার এত ক্ষতি হতো না। যে ভাবে তাড়াহুড়োর মধ্যে যাত্রা শুরু করতে হয়েছিলো, সেই পরিস্থির কথা চিন্তা করে, ল্যাণ্ডিং গিয়ারের কথা ভুলে গিয়ে আকাশে ওড়ার জন্যে ওই তিনজন তরুণকে কোনো মতোই দোষ দেওয়া যায় না। সত্যি বলতে কি, শারীরিক দিক থেকে আমাদের

কারুরই কোনো ক্ষতি হয়নি। গুঁড়িয়ে যাওয়া কাঠের বাক্সে আর ভাঙা বোতলের টুকরের মধ্যে দিয়ে কোনো রকমে পথ করে আমরা সুন্দর মাটির বুকে পা রাখতে পেরেছিলাম।

জ্বলন্ত সূর্যের নিচে, আরব মরুভূমির বুকে দাঁড়িয়ে আমি তখন নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রয়েছি আমাদেরই দিকে দ্রুত ছুটে আসা কয়েকটা জীপ আর অ্যাম্বুলেন্সটার দিকে।

সহযোগী ছোকরাটিই প্রথম মুখ খুললো, 'যাক, শেষ পর্যন্ত তাহলে পৌঁছনো গেলো!'

'হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত পৌঁছনো গেলো!' সহকারী চালক এমন ভাবে কথাগুলো বললো, যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

'আসলে কি জানেন, স্যার,' উচ্ছল খুশিতে চলকে উঠে চালক হাসতে হাসতে আমাকে বললো, 'একবার যদি আপনার মাথায় ঢোকে যে যেভাবেই হোক আপনাকে নামতে হবে—তাহলে চাকা থাকলেও যা, না-থাকলেও তাই।'

'আমার মনে হয় গরমেই চাকাগুলো হয়তো আটকে গিয়েছিলো।' উদ্দীপ্ত চোখে সহকারী চালক বললো।

'পৌঁছলাম বটে, কিন্তু বোতলগুলোর জন্যে আমার সত্যিই খুব খারাপ লাগছে!' চকিতে ম্লান হয়ে উঠলো চালকের কণ্ঠস্বর।

'আমার মনে হয় পরে এর জন্যে আমাদের নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হবে।' সহযোগী ছেলেটি ঘাম মুছতে মুছতে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'এর চাইতে অ্যামোনিয়া বওয়া ঢের ভালো!'

'না, ক্লোরিস,' রাত্তিরে খেতে বসে মিস্টার ব্যাক্সটার তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'রাশিয়ানদের যে হাইড্রোজেন বোমা রয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

'আমি কিন্তু একটুও বিশ্বাস করি না,' দুজনের মাঝখানে যে চওড়া মেহগনি কাঠের টেবিলটা রয়েছে, তার অন্য প্রান্ত থেকে ক্লোরিস শান্ত স্বরেই জবাব দিলো।

'আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে যে কথাটা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে।' থমথমে গলায় মিস্টার ব্যাক্সটার বললেন। 'আজ সকালেই সমারভিলের সঙ্গে এ সম্পর্কে কথা হচ্ছিলো। ওয়াশিংটনে কয়েকশো কোটি ডলার ব্যয়ে যে বিরাট পরমাণু প্রকল্পটার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েই ও বললো রাশিয়ানদের যে হাইড্রোজেন বোমা আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এসব ব্যাপার ওদেরই ভালো জানার কথা, ক্লোরিস।'

'তবু আমার অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, হেনরি,' ওর ঠিক পাশটিতে দাঁড়িয়ে খানসামার এগিয়ে ধরা পাত্র থেকে মাখনে সেদ্ধ মটরশুটি তুলে নিতে নিতে ক্লোরিস হাসলো। 'মাখন দেওয়া মটরশুটি আমার খুব ভালো লাগে। এর সঙ্গে অন্য কোনো সব্জীর তুলনাই হয় না। এই, টম্পসনরা একটা নতুন ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান চাকর এনেছে, তুমি জানো? ওরা ওকে কিংগসটন থেকে নিয়ে এসেছে। সবাই যে বলে এখানে ভালো কাজের লোক পাওয়া যায় না, কথাটা কিন্তু ঠিক, সত্যিকারের যোগ্য কাজের লোক একটাও পাওয়া যায় না। ওই চাকরটা উচ্চারণ, কথা বলার ঢঙ সত্যিই ভারি চমৎকার। না, অসম্ভব, হেনরি!'

'কি অসম্ভব?' মিস্টার ব্যাক্সটার ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন।

'রাশিয়ানদের হাইড্রোজেন বোমা থাকাটা। ওরা নিতান্তই বর্বর। ঠিক কালারা যেমন কোথায় যেন চাষ-আবাদকারী মালিকদের সঙ্গে ঝামেলা পাকাচ্ছে, ওরাও ঠিক তেমনি বর্বর…ওই যে, সেই জায়গাটার কি যেন নাম, হেনরি?'

'কেনিয়া?'

'হ্যাঁ, কেনিয়া! অনেকে বলে ওইসব ভয়ঙ্কর লোকদেরও নাকি হাইড্রোজেন বোমা আছে। এই তো গত সপ্তাতেই মিস্টার ইউজিন লিয়নস আমাদের মহিলা সঙ্ঘে রাশিয়ানদের ওপর একটা বক্তৃতা দিলেন…সত্যি হেনরি, তুমি যদি কখনও শুধু একবারটি শুনতে…অবশ্য কোথায় ওরা হাইড্রোজেন বোমা লুকিয়ে রাখতে পারে সে সম্পর্কে উনি স্পষ্ট কোনো ছবি তুলে ধরতে পারেননি। আর পারবেনই বা কেমন করে, যেখানে কারুর পায়ে জুতো নেই, বলতে গেলে সারাটা জাত এক রকম খালি পায়েই হাঁটে, সেখানে স্পষ্ট করে কিছু বলা কি করে সম্ভব তুমিই বলো? তবে এসব ব্যাপার মিস্টার লিয়নস খুব ভালো করেই জানেন, কেননা উনি প্রায় সারাটা জীবন রাশিয়ানদের ত্রুটি-বিচ্যুতির ওপর পড়াশোনা করেই কাটিয়েছে…।'

'তা সত্ত্বেও ওদের যে ওই জঘন্য হাইড্রোজেন বোমা আছে, এটাই বড় কথা।' গোঁয়াড়ের মতো মিস্টার ব্যাক্সটার নিজের জেদ বজায় রাখার চেষ্টা করলেন।

'তাহলে ওরা নিশ্চয়ই চুরি করেছে। এ থেকেই বোঝা যায় চারদিকে পরমাণু-গুপ্তচর ছড়িয়ে রাখা সত্ত্বেও, এমন কি হোয়াইট হাউসে মিস্টার ট্রুম্যানের মতো মানুষকে রেখেও কোনো লাভ হয়নি।'

'ক্লোরিস,' রুক্ষ স্বরে ব্যাক্সটার দ্রুত বাঁধা দিলেন। 'তোমার আমার মতো মানুষদের সমস্ত ব্যাপারটাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আর একবার ভালো করে ভেবে দেখা উচিত। চুরি ওরা করেনি। ওরাই প্রথম আবিষ্কার করতে পেরেছে।'

সাধারণত ঘুমের ব্যাপারে মিস্টার ব্যাক্সটারের কোনোদিনই তেমন

অসুবিধে ছিলো না, কিন্তু সেদিন রাত্তিরে তিনি একটুও ভালোভাবে ঘুমোতে পারলেন না। স্বপ্নে দেখলেন তিনি যেন পরমাণুতে পরিণত হয়েছেন, এমন কি সত্তার মৌলিক শক্তিতে বিলীন হয়ে যাবার পরেও তীব্র একটা ব্যথা অনুভব করছেন। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেই তিনি প্রশমিত কণাপুঞ্জে পরিণত হলেন, তারপর হঠাৎ এক সময় ঘেমে নেয়ে জেগে উঠলেন। ব্যাক্সটারের বয়েস তিপ্পান্নো, মাত্র অল্প কয়েকদিন আগেই ডাক্তার তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করে জানিয়েছেন সবকিছুই যথাযথ এবং আরও ত্রিশটা বছর ভালোভাবে বেঁচে না থাকার কোনো যুক্তিই তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। 'চুলোয় যাগ্‌গে ভালোভাবে বেঁচে থাকা!' শোবার ঘরের নিতল আঁধারে ব্যাক্সটার নিজেই নিজেকে শাসানো ভঙ্গিতে চাপা গলায় বলে উঠলেন।

মিস্টার ব্যাক্সটার নিজেকে উৎপাদন-শিল্পের একজন সক্রিয় অধ্যক্ষের মতো ভাবতেই ভালোবাসেন, যদিও লগ্নীপত্রে বিনিয়োগ ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য তাঁর কিছুই নেই। তবু, বছরে দু মাস ছুটি ছাড়া, সপ্তায় পাঁচদিন করে যে তিনি নিয়মিত খামার-বাড়িতে যান, এর জন্যে গর্ব অনুভব করেন। সপ্তায় পাঁচদিন তিনি গত কুড়ি বছর ধরেই যাচ্ছেন এবং এর জন্যে যে ফল পেয়েছেন, তার জন্যেও তিনি একই গর্ব অনুভব করেন। তাঁর বাবা পুরনো, প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া একটা খামারবাড়ি রেখে গিয়েছিলেন, যেখানে পাঁচশো মানুষ কাজ করতো, যার আয় বছরে দশ লক্ষ ডলারকে কোনোবারেই অতিক্রম করতে পারেনি। বরং কোনো কোনো বারে লাভের মুখ প্রায় দেখেনি বললেই চলে। আজ সেই জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ছাব্বিশ একর আর সাত হাজার লোক কাজ করে। ১৯৫৪ সালে প্রতিটা শেয়ারের মূল্য দেওয়া হয়েছে এগারো ডলার বাইশ সেন্ট করে। এর জন্যে অবশ্য জেনারেল মোটরসকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

লেখার টেবিলের সামনে বসে ডাকে আসা চিঠিপত্রের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতেই ব্যাক্সটার বৈদ্যুতিক ঘন্টি টিপে আভ্যন্তরীণ

যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁর সচিবের সঙ্গে কথা বললেন। ভদ্রমহিলাকে জানালেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, অর্থাৎ দফতরে এসে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই মিস্টার সমারভিলকে যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

মিস্টার সমারভিল বছরে দশ হাজার ডলার মাইনের কর্মচারী, তিনটি সন্তানের পিতা। পরনে ঢিলে-ঢালা টুইডের পোশাক, চোখে কালো শিং-এর চশমা, মুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ। বিজ্ঞানী না হয়ে তিনি যদি অন্য কিছু হতেন, অন্তত পরিচালন যোগ্যতার জন্যে বছরে পঁচিশ হাজার ডলার রোজগার করতে পারতেন। কিন্তু মিস্টার ব্যাক্সটারের কর্মী-পরিচালক বব হারম্যান, অকেজো বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস করে না, তার ধারণা ওই দশ হাজার ডলারই জলে যাচ্ছে। যেহেতু মিস্টার ব্যাক্সটার বুদ্ধিজীবীদের তেমন বিশ্বাস করেন না, আর সমারভিলও অপরিহার্যভাবে নিজেকে জাহির করতে অক্ষম—তাছাড়া আজকের দিনে 'বিজ্ঞান' শব্দটা যখন বস্তুতপক্ষে ধ্বংসের সঙ্গেই সম্পৃক্ত, তখন তাঁর পদমর্যাদার কোনো মূল্য নেই, মাইনেটাও শেকড় গেড়ে বসে রয়েছে একই জায়গায়। মহার্ঘ আসবাব দিয়ে সাজানো ব্যাক্সটারের অফিসঘরে ঢুকে তিনি ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে তাকালেন, মনিবের ইঙ্গিত পেয়ে বসলেন টেবিলের মুখোমুখি আসনটায়।

'তোমার ওই জঘন্য বোমার কথা ভাবতে ভাবতে কাল রাত্তিরে একদম ঘুমতে পারিনি, সমারভিল?' নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে মিস্টার ব্যাক্সটার ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন। 'আমর স্ত্রীর ধারণা রাশিয়ানদের হাইড্রোজেন বোমা নেই। এসব ব্যাপারে উনি আবার দারুণ বুদ্ধিমতী। আসলে কি জানো, ওপর থেকে যতটা না হোক, ভেতরে ভেতরে মেয়েদের সহজাত ধারণাগুলো খুব প্রখর।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক, তবে এক্ষেত্রে নয়,' ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতেই সমারভিল অস্ফুটে বললেন।

'তার মানে…'

'হ্যাঁ, স্যার, ওদের যে হাইড্রোজেন বোমা আছে সে বিষয়ে কোনো

সন্দেহ নেই।' সমারভিলের মুখের অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো উনি যেন নিজেই রাশিয়ানদের হাতে ওই ভয়ঙ্কর বোমাগুলো তুলে দিয়েছেন। 'মানে, আমি বলতে চাইছি স্যার, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকা উচিত নয়। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, মিস্টার ব্যাক্সটার —সংবাদপত্র, পুলিসীসূত্র বা গুপ্তচরের মাধ্যমে পাওয়া খবর এটা নয়। আমরা খবর পাই যন্ত্রের মাধ্যমে, এবং যন্ত্র কখনও মিথ্যে খবর দেয় না।'

'কিন্তু সেনেটর হাউল্যাণ্ডের ব্যক্তব্য এ সবই নাকি কমিউনিস্টদের রটানো গুজব। রাশিয়ানদের পক্ষে পঞ্চাশ বছরের মধ্যেও হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করা সম্ভব নয়।'

মিস্টার সমারভিল চুপটি করে বসে রইলেন। এ প্রসঙ্গে সেনেটর হাউল্যাণ্ডের সঙ্গে তিনি বিরোধিতা করতে চান না।

নীরবতা ভেঙে ব্যাক্সটারই প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু তুমি নিজে সুনিশ্চিত তো?'

'আমার ধারণা পরমাণু নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত, মিস্টার ব্যাক্সটার। এমন কি আমি শুনেছি, প্রেসিডেণ্ট পর্যন্তও সুনিশ্চিত।'

'আমি তো সেটাই অবাক হয়ে ভাবছি, সারাক্ষণ গলফ্ না খেলে উনি বসে বসে করছেনটা কি? আচ্ছা সমারভিল, সবাই যে এই বোমার কথা বলছে, তা কি সত্যি সত্যিই আছে?'

'হ্যাঁ, স্যার,' অপরাধীর মতো বিষণ্ন স্বরে উনি স্বীকার করলেন। 'ঠিক মতো একটা বোমা যদি কনেকটিকাটে ফেলা যায়, তাহলে সারাটা রাজ্যের জীবন্ত যা কিছু সবই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

চুলোয় যাগ্‌গে কনেকটিকাট! এই ওহিওতে কি হবে তাই বলো?'

'সেটা অবশ্য বাস্তব পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে, মিস্টার ব্যাক্সটার। ধরুন, ওর সঙ্গে সামান্য একটু কোবাল্ট যোগ করা হলো এবং হ্রদের আশেপাশে কোথাও ফেলা হলো, তখন যদি দখিনা বাতাস বয়, তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা একইভাবে কার্যকরী হবে।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছো একটা বোমায় ওহিওর সবাই মারা যাবে?'

'হ্যাঁ, স্যার, গরু শুয়োর পশুপাখি থেকে শুরু করে সবাই। এমন কি গম বা অন্যান্য শস্যও বাদ যাবে না।' সমারভিল এমন ভাবে কথাগুলো বললেন, যেন মিথ্যে না বলতে পারার জন্যে নিজেই লজ্জিত।

'উফ্ঃ, কি জঘন্য!'

'সত্যিই ওটা খুব মারাত্মক ধরনের অস্ত্র।'

'ওয়াশিংটন এসব খবর জানে?'

'হ্যাঁ, স্যার। এ সম্পর্কে ওরা সুন্দর একটা প্রবন্ধও প্রকাশ করেছে—যাকে বলা যায় সত্যিকারের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা।'

'তাহলে এ সম্পর্কে কিছু না করে ওরা ঠুঁটো জগন্নাথের মতো চুপচাপ বসে রয়েছে কেন?'

সমারভিল মনে মনে ভাবলেন এ সম্পর্কে হয়তো ওদের কিছুই করার নেই, কিন্তু তাঁর মনোভাব ভাষায় প্রকাশ করলেন না। তিনি ভালো করেই জানেন তাঁর মতো একজন বিজ্ঞানীর রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়।

একটু চুপ করে থেকে ব্যাক্সটার আবার নিজে থেকেই জিগেস করলেন, 'আমরাও তো মস্কোর ওই একই জিনিস করতে পারি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তা পারি।'

ভ্রূ কুঁচকে নির্নিমেষ চোখে বিজ্ঞানীর মুখের দিকে তাকিয়ে মিস্টার ব্যাক্সটার প্রায় মিনিট খানেকের জন্যে চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর উত্তেজিত স্বরে তিনি ফেটে পড়লেন, 'চুলোয় যাগ্‌গে ও সব। তোমার কি মনে হয় না সমারভিল, ওয়াশিংটনের ওই সব মূর্খগুলোর সবকিছু ফেলে রেখে এখনই মাটির নিচে আশ্রয় বানাতে শুরু করে দেওয়া?'

'শুনতে যতটা সহজ আসলে কিন্তু ততটা সহজ নয়, মিস্টার ব্যাক্সটার। বিমান আক্রমনের সময় সাধারণত যে ধরনের আশ্রয় বানানো হয়—গত যুদ্ধের সময় যেমন বানানো হয়েছিলো, সে ধরনের আশ্রয়

এ ক্ষেত্রে কোনো কাজেই আসবে না। এমন কি সুড়ঙ্গ কেটে মাটির অনেক গভীরে গেলেও তেমন কোনো লাভ হবে না।'

'তার মানে তুমি কি সরাসরি আঘাতের কথা বলছো, সমারভিল?'

'সরাসরি আঘাত বলে কোনো শব্দের কথা আমরা এখনও পর্যন্ত ভাবতেই পারছি না।' মিস্টার ব্যাক্সটারকে বৈজ্ঞানিক কোনো কিছু ব্যাখ্যা করে বোঝাতে গিয়ে বরাবরই যেমন আগ্রহ অনুভব করেন, এখন উনি আরও মন দিয়ে শুনতে চান দেখে সমারভিল মনে মনে উচ্ছ্বসিত না হয়ে পারলেন না। এই ব্যাখ্যার বিরূপ কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে সে সম্পর্কে কিছু না ভেবেই তিনি আরও বিস্তারিত ভাবে বোঝানোর আগ্রহ অনুভব করলেন। 'তবে হ্যাঁ, দশ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যের যাকিছু তাকে আপনি এক ধরনের সরাসরি আঘাতই বলতে পারেন, তবে আবহাওয়া দূষিত করার ব্যাপারটা দুশো কি তিনশো মাইল ব্যাসাধ পর্যন্তও বিস্তৃত হতে পারে, কিন্তু সেটা নির্ভর করছে বিস্ফোরকের গঠন প্রণালীর ওপর। তথ্যের দিক থেকে, ছোট্ট একটা কোবাল্ট বোমাও অনুকূল বাতাসের সহায়তা পেলে আমেরিকা উপমহাদেশের সমস্ত মানবজাতিকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। তথ্যের দিক থেকে সন্দেহের কোনো অবকাশ না থাকলেও, বাস্তবে অবশ্য তেমনটা নাও ঘটতে পারে। তবু সরাসরি আঘাত বলতে যা বোঝায়, আমরা যেমন এখনও সেই শব্দটার কথা ভাবতে পারছি না, ঠিক তেমনি আবার সেই সম্ভাবনাকে উপেক্ষাও করা যাচ্ছে না। সম্ভবত এই কারণেই ওয়াশিংটনকে ব্যর্থ হতে হয়েছে।'

'আচ্ছা, বাতাসকে দূষিত করার ব্যাপারটা কতদিন পর্যন্ত থাকতে পারে?'

'সত্যি বলতে কি, এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলা মুশকিল, কেননা এ রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন আমাদের কখনও হতে হয়নি। তবে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে কয়েকদিন থেকে শুরু করে কয়েক শতাব্দী পর্যন্তও কার্যকর অবস্থায় থাকতে পারে।'

'কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত।' মিস্টার ব্যাক্সটারের মুখটা আপনা থেকেই হাঁ হয়ে গেলো।

'হ্যাঁ, স্যার। পৃথিবীর ওপরের যা কিছু প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে বটে, তবে জলের নিচের প্রাণীদের কোনো ক্ষতি হবে না। তারপর কালের বিবর্তনে, আজ থেকে প্রায় একশো কোটি বছর পরে হয়তো আবার একদিন মানুষের অস্তিত্ব দেখা দেবে।'

'ওসব সান্ত্বনার কোনো অর্থ ই হয় না, সমারভিল,' মিস্টার ব্যাক্সটার বলে উঠলেন।

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক,' কি যেন ভাবতে ভাবতেই সমারভিল জবাব দিলেন, 'তবে নিজেদের জন্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ আস্তানা তৈরি করে নেওয়া যায়। সেটা হবে মাটির অনেক নিচে, সম্পূর্ণ রুদ্ধ একটা আশ্রয়, এবং ওটাকে এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে কমপক্ষে পাঁচটা বছর অত্যন্ত ভালো ভাবে থাকা যায়। এতে অবশ্য নানান বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি সমস্যা দেখা দেবে, তবে আমার ধারণা সেগুলোর সমাধান করাও সম্ভব।'

'আচ্ছা, ওই ধরনের একটা আস্তানা সম্পূর্ণ করতে গেলে মোটামুটি কত খরচ পড়বে বলে তোমার মনে হয়?' আগ্রহভরেই মিস্টার ব্যাক্সটার জানতে চাইলেন।

বিভিন্ন স্থপতিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, প্রতিটা খুঁটিনাটি হিসেব সংগ্রহ করতে গেলে কমপক্ষে একমাস সময় লাগা উচিত, কিন্তু সমারভিল জানেন মিস্টার ব্যাক্সটার এখুনি জবাব চান—তা যদি নির্ভুল না হয় তবুও। তাই সমারভিল সামনের দিকে ঝুঁকে, চোখ বন্ধ করে অত্যন্ত দ্রুত হিসেব কষতে শুরু করলেন আর ব্যাক্সটার অস্বাভাবিক উৎকণ্ঠিত এক নীরবতার মধ্যে চুপচাপ বসে রইলেন। অবশেষে সমারভিল চোখ মেললেন। সন্দিগ্ধ গলায় কোনো রকমে বললেন, 'আমার ধারণা ত্রিশ লক্ষ ডলারের মধ্যে যেতে হয়ে পারে—অবশ্য এটা আদৌ সঠিক হিসেব নয়, তবে এর চাইতে খুব একটা বেশি খরচ পড়বে না।'

সেদিন দুপুরে ক্লিভল্যাণ্ডে হার্ভে র‍্যামসনের সঙ্গে ব্যাক্সটারের মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা পাকা ছিলো। মিস্টার র‍্যামসনের বয়েস আটষট্টি, যুদ্ধের সময় বিমান-সংক্রান্ত ব্যবসায় শুধু সরকারী লেন-দেনের ওপরেই পঞ্চাশ লক্ষ ডলার মুনাফা লুটেছেন, ওয়াশিংটনে হেন লোক নেই যাঁকে তিনি চেনেন না, সম্প্রতি বিশেষ একটা কাজেই ওয়াশিংটন থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় সংসদের প্রতিটি সভ্য, এমন কি রাষ্ট্রপতিরও প্রথম নাম ধরে ডাকেন, ওঁরাও তাঁকে হার্ভে বলেই সম্বোধন করেন। এ হেন মানুষটার বিস্ময় জাগানো সম্ভ্রমের সামনে কিছুটা সঙ্কুচিত না হয়ে বা তাঁর মতামতের ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে মিস্টার ব্যাক্সটারের কোনো উপায় ছিলো না। তাই মধ্যাহ্ন-ভোজের এক ফাঁকেই তিনি জানতে চাইলেন রাশিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধা সম্পর্কে ওঁর মত কি।

'আগে কিংবা পরে, যখনই হোক—যুদ্ধ বাঁধতে বাধ্য।' মিস্টার র‍্যামসন বেশ জোর দিয়েই শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন। 'অন্তত বাঁধানো হবেই।'

'কিন্তু হাইড্রোজেন বোমা কি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলবে না?' মিস্টার ব্যাক্সটার সাগ্রহে জানতে চাইলেন।

'বিশ্বাস কোরো না ওদের তা আছে, আর যদি থাকেও—বিশ্বাস কোরো না কিভাবে তাকে ব্যবহার করতে হয় ওরা তা জানে। কারিগরী আর প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে রাশিয়া এখনও ততটা উন্নত হয়ে উঠতে পারেনি। ওটা নিতান্তই একটা চাষা-ভুষোর দেশ।'

'কিন্তু ধরুন ওদের যদি তা থাকে?' ব্যাক্সটার তখনও নিজের জেদ ধরে রেখেছেন।

'তাহলে এর একটাই জবাব হয়—ওগুলোকে ব্যবহার করার আগে চোখের পলকে গিয়ে একেবারে ধ্বংস করে দিয়ে আসা। সেটাই হবে সত্যিকারের যোগ্য প্রতিশোধ।'

কিন্তু কেন জানি সেই 'যোগ্য প্রতিশোধ'টা মিস্টার ব্যাক্সটারের তেমন মনঃপূত হলো না এবং সেদিনও রাত্তিরে তিনি ভালোভাবে ঘুমতে

পারলেন না। এবার অবশ্য দুঃস্বপ্নের পরিবর্তে তিনি এমন একটা স্বপ্ন দেখলেন, যা বলতে গেলে এক রকম ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর অন্তর্দৃষ্টিরই ফলশ্রুতি। এ সম্পর্কে তিনি বন্ধু-বান্ধব বা কাউকেই কিছু বলেননি, অথচ সেই স্বপ্নই দেখলেন। স্বপ্নে দেখলেন তিনি উঁচু একটা পাহাড়ী চূড়ার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পাশে রয়েছে তাঁর স্ত্রী, মেয়ে, দুই ছেলে, ছেলেদের বউ আর তাদের ছোট বাচ্চারা—আর তাঁর পায়ের নিচে সারাটা পৃথিবী মৃত, নিশ্চুপ হয়ে পড়ে রয়েছে। ঠিক তখনই শোনা গেলো একটা কণ্ঠস্বর, 'যাও, এবার গিয়ে ফলে ফুলে পৃথিবীটাকে সুন্দর করে গড়ে তোলো।' কণ্ঠস্বরটা যেমন অনন্য, স্বপ্নটাও ঠিক তেমনি দুর্লভ সুন্দর। সতেজ, মিষ্টি একটা অনুভূতি নিয়ে ব্যাক্সটার জেগে উঠলেন। অভিশপ্ত ওই বোমাগুলোর নাম শোনার পর থেকে এই প্রথম তিনি একটু স্বস্তি অনুভব করলেন।

'ক্লোরিস,' প্রতারাশের সময় তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'শুধু আমাদের জন্যে বিমান-আক্রমণে আশ্রয় নেবার মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা কুঠরি বানাচ্ছি।'

'আমার মনে হয় তুমি ভেবেচিন্তেই এটা ঠিক করেছো, হেনরি।'

মুখে বললেও, সমারভিলের পরিকল্পনা অনুযায়ী সেটা যে কি ধরনের কুঠরি হবে, সে সম্পর্কে মিসেস ব্যাক্সটারের কোনো ধারণাই ছিলো না।

পরবর্তী কুড়িটা সপ্তাহ নিরাপদ আশ্রয়টা গড়ে তোলার ব্যাপারে মিস্টার ব্যাক্সটার অসম্ভব ব্যস্ত রইলেন। হ্রদের সামনে তিনশো একর বিস্তৃত নিজস্ব ভূসম্পত্তিতে ওটা গড়ে তোলার কাজ শুরু করলেন, ফলে যতটা গোপনীয়তা প্রয়োজন তা রক্ষা করতে তাঁর কোনো অসুবিধে হয়নি। সমস্ত পরিকল্পনাটা সমারভিল নিজে হাতে তৈরি করেছিলেন এবং এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে প্রতিভাবান তিনজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ারকে নিযুক্ত করেছিলেন।

এই তরুণ ইঞ্জিনিয়াররা যথেষ্ট সপ্রতিভ হওয়া সত্ত্বেও মিস্টার ব্যাক্সটার মনে করতেন—এই যে আশ্রয়টা গড়ে উঠে, এটা ওদের

নয়, তাঁর নিজের। ফলে যতটা সম্ভব তিনি নিজেও দেখাশোনা করতেন। এখন আর ক্লাবে সময় নষ্ট না করে বিরাট একটা পরিবারের দীর্ঘ কয়েক বছরেরর জন্যে যা যা প্রয়োজনীয়, সেই তালিকা প্রস্তুত করতেই ঘন্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেন। যে ধারায় ব্যাক্সটার পরিবার চলতে অভ্যস্ত, তাকে বজায় রাখতে গেলে যে কি অসংখ্য ধরনের জিনিসের প্রয়োজন, তা ভাবতে গিয়ে মিস্টার ব্যাক্সটার মাঝে মাঝে সত্যিই অবাক হয়ে যান—অবাক হয়ে যান স্ত্রীর আচরণেও।

'তুমি কি ভাবো পাঁচ-পাঁচটা বছর আমি ওই গর্তের মধ্যে মুখ গুঁজে কাটাবো আর ঘরের কাজকর্ম করবো?' ক্লেরিস ঝাঁঝিয়ে উঠতেন। 'না হেনরি, তুমি বরং অন্য কিছু ভাবো।'

'ওটা গর্ত নয়, ক্লেরিস।' শান্তস্বরেই ব্যাক্সটার জবাব দিতেন। 'হোয়াইট হাউসে মাটির নিচের আইক যেমন, সব দিক থেকে আমাদের ঘরগুলোও ঠিক তেমনি সুন্দর। তবে বলতে পারো ঘরের সংখ্যা খুব একটা বেশি নয় এবং এখন আর আলাদা করে যোগ করারও কোনো উপায় নেই।'

'কিন্তু আমি তোমাকে এই সাফ জানিয়ে রাখলাম—হয় তুমি চাকর-বাকরদের ঘর যোগ করবে, নয়তো আমাকে ছেড়ে দেবে।'

'আড়াই লক্ষ ডলার খরচ করে আমি এখন আবার একটা ঘর বানাবো কোত্থেকে?'

'কত খরচ করে!' ক্লেরিস এমনভাবে স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন যেন এই প্রথম তাঁকে দেখছেন। 'সত্যি কোরে বলো তো হেনরি, আমাদের ওই কুঠরিটা বানাতে মোট কত খরচ পড়ছে?'

'চাকর-বাকরদের ঘর ছাড়া প্রায় ত্রিশ লক্ষ ডলার।'

'নাঃ, সত্যিই দেখছি তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গ্যাছে!'

বিস্ময়ে ওঁর স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার ভঙ্গি দেখে ব্যাক্সটার সেই প্রথম বুঝতে পারলেন যে ক্লেরিসও অর্থ নিয়ে মাথা ঘামায়।

'যখন সত্যি সত্যিই হাইড্রোজেন বোমা পড়তে শুরু করবে তখন কিন্তু আর তোমার ও কথা মনে হবে না।'

ক্লেরিস যখন দেখলেন যে হেনরি ওঁদের ইউরোপ পরিভ্রমণের সমস্ত পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছেন, এমন কি জানিয়েও দিয়েছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত না বোমা পড়তে শুরু করছে, ওঁরা আর পরিভ্রমণ করবেন না, তখনই ওঁর টনক নড়লো। দু-সপ্তা উনি স্বামীর সঙ্গে কথাই বললেন না। অবশ্য নিরাপদ আশ্রয়টা নিয়ে স্বামী এত অসম্ভব ব্যস্ত যে ওই কথা না বলার ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পেরেছেন কিনা সন্দেহই রয়ে গেলো। ভাঁড়ারের তালিকা নিয়েই এখন তাঁর প্রায় সারাটা রাত কেটে যায়। যেটা তাঁর কাছে সব চাইতে আশু প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে—সেই কুড়ি হাজার ফাইল ভিটামিনের বড়ি কেনার আগে গোটা পাঁচেক প্রচার-পুস্তিকার ওপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া। বারবার তিনি নিজের মনেই আক্ষেপ করেন কেন অন্তত একটা ছেলেকে ডাক্তারি শিক্ষার জন্যে তালিম দেননি। একদিন আবার যা পৃথিবীকে ফুলে-ফলে সমৃদ্ধশালী করে তুলবে, তালিকা অনুযায়ী সেই সব বীজের জন্যে কীটনাশক ওষুধও সংগ্রহ করে রাখেন, কৃষিবিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় যে পত্রিকা, সেই 'ইউ. এস. নিউস অ্যাণ্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট'-এর প্রতিটা শব্দ আরও সতর্কতার সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন, খোঁজার চেষ্টা করেন যুদ্ধের সামান্যতমও কোনো ইঙ্গিত কোথাও আছে কি না। যেহেতু নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এখন আতঙ্কে প্রায়ই তাঁর বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে, কেবলই মনে হয় যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে ওঠার আগেই হয়তো ওরা বোমা ফেলতে শুরু করবে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, কমিউনিস্টদের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা—এককালে যা ছিলো তাঁর গর্বের বিষয়, এমন কি আজ ওহিওর একজন কোটিপতি হয়েও, তাঁর সেই অনুভূতিটা ক্রমশ মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। রাশিয়ানরাই আজ তাঁর জীবনের মূল উদ্দেশ্যটাকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেছে, এমন কি কখনও কখনও তাদের প্রতি উষ্ণ একটা

কৃতজ্ঞতাও বোধ করেন। দিন দিন তিনি ধর্মের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে উঠছেন, বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে স্বপ্নে সেদিন ঈশ্বরের সঙ্গেই তাঁর মুখোমুখি সাক্ষাৎ ঘটেছিলো। এমন কি দীর্ঘদিন লেগে থেকে হার্ভে র‍্যামসন প্রতিশ্রুতি মতো তাঁর জন্যে হোয়াইট হাউসে যে মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই গর্বিত আনন্দও এই দুর্লভ অনুভূতিকে একটুকু ম্লান করে দিতে পারেনি।

হ্রদের বুকে ঝুঁকে আসা সুন্দর মাঠটা ইতিমধ্যেই চমৎকার একটা নির্মাণ প্রকল্পের রূপ নিয়েছে। বেলচার বিশাল একটা সারি এগিয়ে চলেছে মাটির গভীর থেকে আরও গভীরে, তারই ফাঁকে ফাঁকে চোখ পড়ে কাঠের ভারা আর ব্যাক্সটার পরিবারের নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করার জন্যে অগনন কংক্রিটের থাম। মাল বোঝাই হয়ে ট্রাকটরগুলো মন্থর গতিতে চলেছে এদিক ওদিক, লোহার বড় বড় বীমগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ক্রেনে করে। মিস্টার ব্যাক্সটারের অন্তর্দৃষ্টির নমুনা অনুসারে দক্ষিণ ওহিওতে গড়ে ওঠা এই অস্থায়ী প্রকল্পতে কাজ করে যে সব অজস্র মানুষ, প্রতি সপ্তায় মাইনের টাকা ভাঙিয়ে তারা ছেলেমেয়েদের জন্যে খাবার, জামা কাপড় কেনে, ঘর ভাড়া দেয়—এসব খবর মিস্টার ব্যাক্সটার কিন্তু কিছুই জানেন না। শেষ পর্যন্ত মাটির নিচের প্রকাণ্ড মজবুত এই বাড়িটা যখন নির্দ্দিষ্ট একটা রূপ নেবে, যা হাইড্রোজেন বোমার সরাসরি আঘাত প্রতিহত করেও টিকে থাকতে সক্ষম, তখন মিস্টার ব্যাক্সটারের মানসিকতা সত্যিকারের একটা সমাধির সঙ্গেই তুলনা করা সম্ভব হবে। পরিচিত-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী, এমন কি খামার বাড়ির অন্যান্য কর্মীদেরও চোখে পড়েছে তাঁর এই পরিবর্তন—ঋজু, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে মাথা উঁচু করে রাখার ভঙ্গি। চোখের দীপ্তি, তাঁর কণ্ঠস্বর, এখন আগের চাইতে অনেক কোমল, অনেক অনেক বেশি আন্তরিক।

আস্তানাটা যখন শেষ প্রায় হয়ে এসেছে, সেপ্টেম্বরের এক সন্ধ্যায় মিস্টার ব্যাক্সটার নিচে নামার সুদীর্ঘ সিঁড়িটার কাছাকাছি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর স্বপ্নসৌধটার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন,

হঠাৎ হ্রদের বুক থেকে শরতের বজ্রবিদ্যুৎগর্ভা এক প্রচণ্ড ঝড় উঠলো। ব্যাক্সটার তাড়াতাড়ি আস্তানাটার দিকে ছুটলেন, কিন্তু পৌঁছাবার আগেই বৃষ্টি ততক্ষণে তাঁকে সম্পূর্ণ ভিজিয়ে দিয়েছে। বাগানের ভিজে মাটিতে, কাদায়, তোড়ে নামা জলস্রোতে পা পিছলে তিনি সশব্দে আছড়ে পড়লেন অনেক নিচের শানবাঁধানো মেঝেতে। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে বৃষ্টির মধ্যেই ঘণ্টাখানেক তিনি সেখানে পড়ে রইলেন। রাতে খাবার সময় পেরিয়ে যাবার পরেও পৌঁছননি দেখে ক্লেরিস চাকর-বাকরদের খুঁজতে পাঠালেন। ওরা যখন মিস্টার ব্যাক্সটারকে খুঁজে পেলো, উনি তার আগেই মারা গেছেন, ঠাণ্ডায় সারা শরীর তখন শক্ত কাঠ।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী সবাই হাজির হলো, সবার সামনেই পড়া হলো তাঁর ইচ্ছাপত্র। গোপন আস্তানাটার কথা কিন্তু কোথাও উল্লেখ করা হয়নি, স্ত্রী ছাড়া তিনি আর কাউকে জানানওনি, কেননা তাঁর ইচ্ছে ছিলো সম্পূর্ণ শেষ হবার পরেই সবাইকে জানাবেন। সেই জন্যে ক্লেরিস মনে মনে ভাবলেন এ সম্পর্কে কাউকে কিছু বলবেন না। শোকসভায় উপস্থিত অতিথিদের অভিবাদন জানাবার সময় কালো পোশাকে ক্লেরিসকে সত্যিই আশ্চর্য রূপসী আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছিলো। উনি যে রীতিমতো রূপসী সে কথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন। ইচ্ছাপত্র অনুসারে হ্রদ সুসংলগ্ন প্রাসাদপম অট্টালিকা এবং গচ্ছিত পঞ্চাশ লক্ষ ডলার পেয়েছেন মিসেস ব্যাক্সটার, আর লগ্নীকৃত সুদের সব টাকা সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে ছেলে মেয়েদের মধ্যে। ক্লেরিস, টাকা পয়সা সম্পর্কে যিনি কোনোদিনই লোভী ছিলেন না, নিজের অংশে উনিই খুশি হলেন সব চাইতে বেশি।

ইউরোপ পাড়ি দেওয়ার আগে ক্লেরিস মাস তিনেক অপেক্ষা করলেন। এই সময়ের মধ্যে উনি হ্রদের ধারের প্রাসাদপম বাড়িটা বিক্রি করে দিলেন, কিন্তু বহু আলোচনা, দর কষাকষি, এমন কি হাইড্রোজেন বোমা আক্রমণের ভয় থাকা সত্বেও, স্বয়ং সম্পূর্ণ গোপন

আস্তানাটার জন্যে কেউই ত্রিশ লক্ষ ডলার ঢালতে রাজি হলো না। উত্তর ফ্রান্সে অষ্ট্রিয়ান একজন কাউন্টের সঙ্গে ক্লেরিসের পরিচয় হলো, যাকে উনি বিয়েও করে ফেললেন। এত অল্প সময়ের ব্যবধানের জন্যে ছেলে-মেয়েরা ব্যাপারটাকে খুব একটা শোভন চোখে নিতে পারলো না। আর কাউন্ট, ব্যবসার সঙ্গে যাঁর কোনোকালেই কোনো সম্পর্ক ছিলো না, তিনি যখন আবিষ্কার করলেন যে হ্রদ সুসংলগ্ন ভূসম্পত্তির মূল্য চল্লিশ লক্ষ ডলার নির্ধারণ করে সেই অনুপাতে কর চাপানো হয়েছে, তখন তিনি স্ত্রীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন জমিটা ওই ভাবেই পড়ে থেকে আগাছায় ভরে যাক। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ বৈদ্যুতিক সিঁড়িটায় মরচে পড়তে শুরু করলো এবং কেউ এসে যতক্ষণ পর্যন্ত না গিলছে তারই প্রতীক্ষায় কুড়ি হাজার ফাইল ভিটামিন নিঃশব্দে সেখানেই পড়ে রইলো।

কখনও কখনও ক্লেরিস যখন আন্তরিকভাবেই ওঁর প্রথম স্বামী, হেনরির কথা ভাবেন, নিজেকে তখন ওঁর কেমন যেন অপরাধী অপরাধী মনে হয়; কিন্তু যখনই আবার পাঁচ বছর মাটির নিচে ওই স্বয়ংসম্পূর্ণ কুঠরিটায় থাকার কথা কল্পনা করেন, সারা শরীর ওঁর শক্ত কাঠ হয়ে উঠে। সেদিক থেকে ওঁর দ্বিতীয় স্বামী, অষ্ট্রিয়ান কাউন্ট, হাইড্রোজেন বোমার কথা কখনও ভুলেও উচ্চারণ করেননি।

কেবল মিস্টার সমারভিলই ছিলেন সত্যিকারের কৃতজ্ঞ। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, আমেরিকান কারিগরী দক্ষতার সঙ্গে বিজ্ঞান যুক্ত হলে হাইড্রোজেন বোমার সরাসরি আঘাতও প্রতিহত করা সম্ভব। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন ভাবেন যে হেনরি জে. ব্যাক্সটার তাঁর এই তথ্য পরীক্ষা করার প্রকৃত সুযোগ কখনও পেলেন না, তখন তিনি সত্যিই খুব বিষণ্ণ বোধ করেন।

মার্টিন অ্যাণ্ডারসনের বাসাটা কারখানা থেকে মাত্র আট সারি বাড়ির তফাতে। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধেবেলায় সে হেঁটে ঘরে ফেরে। যেদিন আবহাওয়া খুব খারাপ থাকে, ঝড়-বৃষ্টি, শিলা কিংবা তুষারপাত হলে তবেই সে কখনও কখনও সহকর্মী বন্ধুদের ভাড়া করা গাড়িতে ওঠে, কেননা সবাই তাকে ভালবাসে। নিজেরা চেপেচুপে বসেও তাকে তুলে নিতে পারলে খুশি হয়, এমন কি তাতেও যদি জায়গা না থাকে কোলে বসিয়ে নিয়ে যায়। তবে সাধারণত সে, এমন কি বৃষ্টি-বাদলার দিনেও, হেঁটে ঘরে ফিরতেই ভালোবাসে। অবশ্য কারখানা থেকে খুব কাছে থাকে বলেই সেটা সম্ভব। এর জন্যে অ্যালিস আর বাচ্ছাদুটোর প্রতি সে যতটা যত্ন ও সময় দিতে পারে, যাদের গাড়ি আছে তারাও তা দিতে পারে না।

অসম্ভব গরম, মানুষের ঘাম আর তেলের গন্ধে ভারি হয়ে ওঠা বাতাসে সারাক্ষণ লেদ মেসিনের সামনে কাজ করতে করতে পায়ে যখন খিল ধরে আসে, তখন ছুটির পর পরিষ্কার তাজা বাতাসে পায়ের সেই খিল ছাড়িয়ে নেবার জন্যে হাঁটতে তার ভালোই লাগে। কারখানা থেকে ঠিক আট সারি বাড়ির তফাতে—সেটা যেমন খুব দূরে নয়, তেমনি আবার খুব কাছেও নয়। তবে এতে সে অনেক কিছু ভাববার অবকাশ পায়—বিশেষ করে নিজের সম্পর্কে, নিজেকে বিশ্লেষণ করার জন্যে, যা কারখানায় তমুল রলোরোল আর চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যে কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাছাড়া সারাদিনের নানান ঘটনার মধ্যে থেকে কিছু কিছু ঘটনাকে মনে মনে সাজিয়ে রাখার এটাই একমাত্র সুযোগ, যা সে ঘরে ফিরে স্ত্রী আর বাচ্ছাদের কাছে বলে তাদের আনন্দ দিতে পারবে।

বাড়িতে পৌঁছনোর পর মোটামুটি ভাবে সে ঘরেই থাকে। সংসারের খরচ বাড়ায় দু বছর আগেই মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। এখন বাচ্ছাদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করতে করতেই তার সন্ধ্যেগুলো কেটে যায়। যার জন্যে সারাটা দিন ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকে, বাচ্ছাদুটো ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত. সেই কয়েক ঘণ্টা সময়, অন্তত সপ্তাহে তিনটে দিন, দূরদর্শনের নানান মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কেটে যায়, যা সে সত্যিই পছন্দ করে। এই সবে ছত্রিশ অতিক্রম করেছে, তবু মাঝে মাঝে মনে হয় বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝি বুড়িয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এই ভাবনা তাকে কোনোদিনই তেমন বিক্ষুব্ধ করে তোলেনি।

অন্য ব্যাপারে যত অসন্তোষই থাক না কেন, স্ত্রী আর বাচ্ছারা তাকে কখনও ক্ষুব্ধ করেনি। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় যখনই সে কারখানা থেকে বেরিয়ে আসে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ওদের সঙ্গ পাবে— এই আনন্দ-অনুভূতিটা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তারপর সন্ধ্যেবেলার দৈনন্দিন ঘটনাগুলো খুবই সাধারণ—বাচ্ছাদের সঙ্গে খেলা, রাত্তিরে খেতে খেতে গল্প করা, বাসন-কসন ধোয়ায় অ্যালিসকে সাহায্য করা, দিনের টুকিটাকি সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো, এটা ওটা সম্পর্কে ভাবা— এমনি ভাবেই রাতটা ফুরিয়ে যায়। যখনই সে কারখানার বাইরে বেরিয়ে আসে, চোখে পড়ে হিমেল গোধূলিবেলা আর বড় বড় বাড়ি-গুলোর মাথার ওপরে কমলা-রঙের সূর্যটার অস্ত যাওয়ার এক দুর্লভ সৌন্দর্য। হিম-হিম ভাব জড়ানো আকাশে একটাও মেঘ নেই। প্রাকৃতিক এই দৃশ্যটা তার ভাবনার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়। ফটকের সামনে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের শুভরাত্রি জানিয়ে সে আপন মনেই হাঁটতে থাকে।

তার ঠিক দুপাশে দুজন মানুষ কখন যে একই সঙ্গে হাঁটতে শুরু করেছে সে প্রায় খেয়ালই করে না, আর যদি কখনও করে, মনে মনে কিছুটা শঙ্কিত না হয়ে পারে না। কেননা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে, প্রায় নিয়মিতই ওরা তার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে যায়, অথচ এমনটা হবার কোথাও

কোনো কারণ নেই। শারীরিক ভয় অ্যাণ্ডারসনের নেই বললেই চলে ; দীর্ঘ, বলিষ্ঠ চেহারা, চওড়া ঢালু কাঁধ, রীতিমতো সমীহ জাগায়। সেই তুলনায় তার দুপাশে হেঁটে যাওয়া মানুষদুটো অনেক ছোট, বয়সেও তরুণ—খুব বেশি হলে ছাব্বিশ, কি সাতাশ। ছিমছাম রুচিসম্মত পোশাক—হাওর-ধূসর সুটের ওপর ছাই রঙের দামী পশমী কোট, কালো বুট। ভরাট মুখ, পাতলা নাক, গাঢ় নীল চোখ। অনেকটা যমজ ভাইয়ের মতো দেখতে ঠিক একই রকম।

অ্যাণ্ডারসন হাঁটা থামালো না। তখন তার মনের মধ্যে কেবল একটাই ভাবনা—আট সারি বাড়ি পেরুতে পারলেই সে ঘরে পৌঁছে যাবে।

দুজনের মধ্যে একজন বললো, 'আরে, আপনি !'

'সন্ধ্যেটা ভারি সুন্দর, তাই না মিস্টার অ্যাণ্ডারসন ?' অন্যজন বললো।

'কি চাই আপনাদের ?' রূঢ় স্বরেই অ্যাণ্ডারসন প্রশ্ন করলো।

'আপনিই তো মার্টিন অ্যাণ্ডারসন, তাই না ?'

'যদি হই-ই, তাতেই বা কি এসে যায় ?'

'ব্যাপারটাকে কেন সহজ করে নিতে পারছেন না, মিস্টার অ্যাণ্ডারসন ? এটাকে আপনি নিতান্তই একটা নিয়মরক্ষা বলে ধরে নিতে পারেন। আমরা রাষ্ট্রীয় তদন্ত দফ্‌তরের* লোক। এই দেখুন আমাদের পরিচয়-পত্র। এর মধ্যে কোনো লুকোছাপা কিছু নেই, দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট।'

একে একে দুজনেই টাকা-পয়সা রাখার ছোট ব্যাগ থেকে তাদের পরিচয়-পত্র বার করে দেখালো। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অ্যাণ্ডারসন একবার প্রতীক আর পরিচয়-পত্রের দিকে তাকালো। না তাকালেও চলতো, কেননা পাশাপাশি হেঁটে যাবার সময়েই সে বুঝতে পেরেছিলো।

* ফেডারল ব্যুরো অফ্‌ ইনভেস্টিগেশন, সংক্ষেপে এফ. বি. আই.

কেউ যদি কোনো কথা না বলে নিয়মিত তোমার পাশাপাশি হেঁটে যায়, তাহলে এ পৃথিবীতে সে যে পুলিস ছাড়া আর কেউ হতে পারে না, সেটা তোমার এক নজরেই বোঝা উচিত। অ্যাণ্ডারসন ততক্ষণ সামনের বস্তিটা পেরিয়ে এসেছে, এখনও তার অত্যন্ত পরিচিত সাতটা ব্লক অতিক্রম করতে হবে—বেসরকারী কবরখানা, কর জমা নেওয়ার সেরেস্তাখানা, কাদায় ভরা একটা মাঠ, যেখানে ছেলেরা ফুটবল খেলে, স্টেস্মুইট নামে একটা পুতুল তৈরির কারখানা, তারপর তিন সারি জীর্ণ কাঠের বস্তিবাড়ি—এগুলোকে অতিক্রম করতে পারলেই সে অ্যালিসকে দেখতে পাবে, নির্জন মুহূর্তের অবকাশে চুমুও দিতে পারবে, হুড়মুড়িয়ে বাচ্ছাদুটো তার কাঁধে চড়ে বসার আগে, হয়তো বলারও সুযোগ পাবে—'জানো, আজ না রাষ্ট্রীয় তদন্ত দফ্‌তরের দুটো লোক আমার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে আসছিলো।' এতে অবশ্য অ্যালিস যদি বিব্রত বোধ করে, তাহলে বলবে, 'চুলোয় যাগ্‌গে, উচ্ছন্নে যাক বেজন্মাগুলো!' এবং এখন মনে মনে সে তা-ই বললো, 'চুলোয় যাগ্‌গে ওরা!'

ওদের একজন বললো, 'সামান্য মাত্র দু-চারটে কথা। আমরা জানি মিস্টার অ্যাণ্ডারসন, আপনি হেঁটে ঘরে ফিরতে ভালোবাসেন। তাই আমরা ভেবেছি আপনার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতেই কয়েকটা কথা বলবো।'

'ব্যাস, তার বেশি আর কিছু নয়।' অন্যজন বললো। 'আমরা শুধু হাঁটতে হাঁটতে আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলবো।'

'কেননা, আমরা জানি মিস্টার অ্যাণ্ডারসন, আমেরিকার আপনি একজন সুনাগরিক। একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। সত্যি বলতে কি, আপনার সম্পর্কে আমরা সবই জানি। যুদ্ধে আপনার কৃতিত্ব, 'সিলভার স্টার,' এমন কি আনজিওতে আপনার সেই দুর্ঘটনার খবরও আমাদের অজানা নয়। আমরা এত কিছু জানি শুনে আপনার নিশ্চয়ই খুব অবাক লাগছে, কিন্তু জানাটাই যে আমাদের কাজ, মিস্টার অ্যাণ্ডারসন। ঠিক এই কারণেই আমরা জানি আপনি আমেরিকার

একজন সুনাগরিক, এবং এও জানি—ঘরে আপনার ভারি চমৎকার স্ত্রী আর ফুটফুটে ছুটো বাচ্ছা আছে।'

'কিন্তু মুশকিল কি হয়েছে জানেন, মিস্টার অ্যাণ্ডারসন,' অন্য জন বললো। 'আমরা যতটুকু জানি, সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া দরকার, নইলে ঘটনাগুলোকে জোর করে আরোপিত করার মতো অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। কারখানায় জনসন, লেভি আর কার্টিসের সঙ্গে যে আপনার দোস্তি আছে আমরা জানি। ওদের সম্পর্কে আমরা প্রায় সব জানি বললেই চলে। ওরা যে লাল গোলাপের চাইতে লাল, তাও আমরা জানি। কিন্তু ওরা হচ্ছে পশমে ছোপানো। তাই ওদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটাই আমাদের সব চাইতে বড় ধাঁধায় ফেলেছে। আমাদের মনে হয় না আপনি ওদের মতো লাল। একটু আগেই বলেছি, আপনাকে আমরা আমেরিকার একজন দেশ-প্রেমিক নাগরিক হিসেবেই দেখি।'

'হ্যাঁ, আমাদের ধারণা তাই,' একজন বললো। 'আর সেই জন্যেই আমরা আপনার সহযোগিতা চাই। দেশপ্রেমিক একজন আমেরিকান হিসেবে আপনি সব সময়েই চাইবেন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে। আমরা অনেক কিছু জানি, একথা সত্যি—কিন্তু তার মানে এই নয় যে সব জানি। জনসন, লেভি, কার্টিসের মতো কারখানায় আরও কত জনই রয়েছে, যারা গোলাপের চাইতেও লাল। ইউনিয়নে আরও অনেকে রয়েছে। ইচ্ছে করলে আপনি সবাইয়ের কথাই ফাঁস করে দিতে পারেন, মিস্টার অ্যাণ্ডারসন। আমাদের এই যে এত সুন্দর একটা দেশ, আর বৈধভাবে নির্বাচিত এই যে সরকার—তার বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করছে, জোর কোরে তাকে উচ্ছেদ করতে চাইছে, আমাদের যা-কিছু প্রিয় সেই সবকিছুকে যারা ধ্বংস কোরে দেওয়ার মতলব ভাঁজছে, আশাকরি তাদের আপনি নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন না এবং সেই জন্যেই আপনি চাইবেন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে।'

অন্যজন বললো, 'কত লোক যে স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। সত্যিকারের যাঁরা প্রকৃত নাগরিক, তাঁরা নিজে থেকেই আমাদের কাছে এসে স্পষ্টই বলেন—আমি আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাই। আমরা তাঁদের স্বাগত জানাই। এতে তাঁদের আদৌ ভয়ের কিছু নেই। আমরা তাঁদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা আর গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিই। দায়িত্বশীল দেশপ্রেমী একজন আমেরিকান হিসেবেই তাঁরা আমাদের কাছে আসেন আর আমরাও তাঁদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানাই।'

'সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন, এতে তাঁদের ভয়ের কিছু নেই। রাষ্ট্রীয় তদন্ত দফতর সম্পর্কে অনেকেই অহেতুক দ্বিধা বোধ করেন। এ সম্পর্কে তাঁরা এমন সব উদ্ভট আজেবাজে গল্প শোনেন, যা তারা বিশ্বাস করেন। কিন্তু সত্যি বলতে কি, রাষ্ট্রীয় তদন্ত দফতর আপনাদেরই সংস্থা, আপনাদেরই প্রয়োজনের জন্যে এটাকে গড়ে তোলা হয়েছে। আর সেই জন্যেই আমরা আপনার সহযোগিতা চাই।'

দিনের আলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে গিয়ে তখন আশ্চর্য মিষ্টি আর নরম একটা লালচে আভায় পরিণত হয়েছে। ওরা অতিক্রম করে চলেছে কর জমা দেওয়ার সেরেস্তাখানা, হন্টের পাঁচ, দশ আর পঁচিশ সেন্টের মনিহারী দোকান, ম্যান্টিনির জুতো সারানোর খুপরি, অনেক দিনের পুরনো নাপিতখানা, হেন্টারম্যালের শুঁড়িখানা, ক্লোভার কেলটিকের ভোজ আর পানশালা। অ্যাণ্ডারসন জানে এর পরেই আসবে সেই ফুটবল খেলার মাঠটা, যেখানে বাচ্চারা খেলছে আর আকাশের পটভূমিতে তখনও যেটুকু ম্লান আলোর রেখা জড়িয়ে রয়েছে, সেই অস্পষ্টতায় যখনই বলটা উঁচুতে উঠছে, শুনতে পাচ্ছে ওদের মিলিত উচ্ছ্বাস।

'আমরা জানি,' অন্যজন বললো, 'দায়িত্বশীল একজন আমেরিকান নাগরিক হিসেবে সবাই যা করেন, আপনিও তা করবেন। আশাকরি

আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন, মিস্টার অ্যাণ্ডারসন।'

'আপনারা জাহান্নমে যান!' অ্যাণ্ডারসন চেঁচিয়ে উঠলো।

'এটা কোনো কাজের কথা নয়, মিস্টার অ্যাণ্ডারসন। আমরা আপনার সঙ্গে দায়িত্বশীল মানুষের মতো কথা কইছি। অন্তত আপনারও উচিত আমাদের সঙ্গে সেই ভাবে কথা বলা।'

'বললাম তো—জাহান্নামে যান।'

'আপনি বড্ড তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না, মিস্টার অ্যাণ্ডারসন?' অন্যজন জিগেস করলো। 'যারা আপনার জন্যে এত করছে, আপনি অনায়াসেই তাদের বলে দিলেন—জাহান্নামে যাও! অথচ এই ধরনের ব্যবহারের জন্যে আমরাও তো একটা কলমের খোঁচায় লিখে দিতে পারি আপনি কমিউনিস্ট। কিন্তু আমরা তা করবো না, কেননা আমরা জানি আপনি কমিউনিস্ট নন। অন্তত এই মুহূর্তে তেমন ভাবার কোনো কারণ নেই, কেননা এ ব্যাপারে আমরা এখনও সুনিশ্চিত নই···ঠিক যেমন সুনিশ্চিত নই—এই মুহূর্তে যেটা বললেন, সেটা আপনি সত্যি সত্যিই বলতে চেয়ে ছিলেন। আমি বলি কি—'হ্যাঁ' বা 'না' বলার আগে আপনি বরং আর একবার ভেবে দেখুন। এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেবার মতো তুচ্ছ ব্যাপার এটা নয়, মিস্টার অ্যাণ্ডারসন।'

'কিংবা আপনি এটাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেও ভেবে দেখতে পারেন—আমরা আপনার কাছে এলাম, বিশ্বাস্ত একজন আমেরিকান হিসেবেই আপনার সহযোগীতা প্রার্থনা করলাম, অথচ আপনি সেই বিশ্বস্ততার কথা ভুলে গিয়ে নির্দ্বিধায় আমাদের বলে দিলেন নরকে যাও! আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার কমিউনিস্ট বন্ধুরাই গুপ্তচরদের সম্পর্কে আজে-বাজে গাল-গল্প করে আপনার মনকে বিষিয়ে দিয়েছে। কেননা গুপ্তচরদের সম্পর্কে ইনিয়ে-বিনিয়ে কিছু বলতে পারলেই কমিউনিস্টরা সব চাইতে বেশি খুশি হয় এবং ওরা চায় না কেউ বিশ্বস্তভাবে সরকারের সঙ্গে সহযোগীতা করুক। কিন্তু এমনও হতে পারে, বিশ্বস্ত একজন

আমেরিকান হিসেবে আপনার সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, সেটা ভুল। ভুল তো আমাদেরও হতে পারে।'

'ভুল আমাদেরও হয়।' অন্যজন বললো। 'এর আগেও আমরা বহুবার ভুল করেছি।'

'চুলোয় যাগ্‌গে আপনাদের ভুল!'

'আমাদের এমনও ভুল হতে পারে যে এই ধরনের সত্যের মধ্যে আদৌ কোনো মাথামুণ্ডু নেই।'

'কিন্তু মুশকিল কি হয়েছে জানেন, মিস্টার অ্যাণ্ডারসন; আমরা যদি তেমন ভুল কিছু করি, তার বিরাট একটা দায়িত্বও এসে পড়ে আমাদের কাঁধে। যে কারখানাটা আপনি একটু আগে ছেড়ে এসেছেন, এখন সেটা আর অন্য সব কারখানার মতো নয়। এখন ওখানে শুধু ট্রাকটারই তৈরি হয় না, সাঁজোয়াও তৈরি হয়। লাল ঢেউকে রুখতে গেলে একদিন যে সাঁজোয়ার প্রয়োজন হবে সব চাইতে বেশি। তাই আমরা যদি কোথাও ভুল করি, তার কৈফিয়ত দিতে হবে আমাদেরই। আজ যদি আপনাকে কেউ বিশ্বস্ত একজন আমেরিকান হিসেবে ভেবে নেয়, তখন হয়তো দেখা যাবে যে সেই ভাবনার মধ্যে যথেষ্ট ভুল ত্রুটি ছিলো।'

'আপনি বরং কারখানার ম্যানেজার, জ্যাক ফ্রেডেরিখস্‌-এর কথাই ভেবে দেখুন না কেন,' অন্যজন বললো। 'নিজের দেশ সম্পর্কে উনি খুবই সচেতন। উনি হয়তো কোনো কারণে জানতে পারলেন যে তাঁর কারখানার একজন শ্রমিক কাজকর্ম কিছু করে না, বা তাঁরই সরকারের অন্য কোনো বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায় না। তিনি হয়তো ওই লোকটা সম্পর্কে খুবই বিরক্ত বোধ করতে পারেন।'

'এমন কি, তিনি কারখানায় ওই রকম কোনো লোককে আদৌ না রাখতে চাইতে পারেন। সোজা দূর করে দিয়ে বলতে পারে—জাহান্নামে যাও।'

'অন্য দিক থেকে আবার ভেবে দেখুন, মিস্টার অ্যাণ্ডারসন—ওই

রকম কোনো লোকের পক্ষে কি অন্য কোথাও কাজ জোগাড় করা সম্ভব? নায়ক হওয়াটা ভালো এবং যে কেউ হতে পারে, কিন্তু যখন আপনার ক্ষুধার্ত শিশুরা খেতে চাইবে, তখন কি করবেন?'

'আমার মনে হয় না, এমনটা ঘটুক মিস্টার অ্যাণ্ডারসন কখনই তা চাইবেন।'

'আমিও তা মনে করি না।' অন্যজন বললো। 'আমার ধারণা মিস্টার অ্যাণ্ডারসন মনেপ্রাণে ষোল আনাই খাঁটি আমেরিকান আর সেই জন্যেই আমরা চাই, একজন খাঁটি আমেরিকানেরই মতো আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।'

'উচ্ছন্নে যান, সরে যান আমার সামনে থেকে।' ক্রুদ্ধ স্বরে অ্যাণ্ডারসন চেঁচিয়ে উঠলো।

চকিতে তরুণ দুজনের মধ্যে এক দ্রুত পরিবর্তন ঘটে গেলো। ওদের হাসিখুশি কবোষ্ণ ভাবটুকু নিমেষে মিলিয়ে গিয়ে তার পরিবর্তে ফুটে উঠলো নৈশ বাতাসের মতো এক হিমেল কঠিনতা। নীল চোখ আর স্বচ্ছল গোলগাল মুখ থেকে নিভে গেলো সমস্ত দীপ্তি।

'ঠিক আছে, মিস্টার অ্যাণ্ডারসন।'

'আপনি যদি ব্যাপারটাকে এই ভাবে নিতে চান, তাই হবে।'

তারপর ওরা দুজন মার্টিন অ্যাণ্ডারসনের দু পাশ থেকে সরে গেলো, মনে হলো ঠিক যেন দু ভাই, হেঁটে গেলো দুটি ভাইয়েরই মতো—হাঁটা-চালায়, পোশাকে, উচ্চতায় ভঙ্গিতে কোথাও কোনো পার্থক্য নেই। তার পাশ থেকে ওরা দুজনে সরে গেছে, এখন অ্যাণ্ডসনের সামনে—তার ঘর, তার বাড়ি, তার প্রাসাদদুর্গ, তার ন' হাজার ডলারের অধিকার; অন্তত যতদিন পর্যন্ত না তার সন্তানরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হচ্ছে, বৃদ্ধ বয়েসের দিনগুলোতে সে আর তার স্ত্রী একটু স্বস্তি পাচ্ছে, একটু উষ্ণতা আর সেই সুন্দর বছরগুলো যা সমৃদ্ধশালী স্বাধীন একটা দেশের উপহার! ওই তো তার বাড়িটা। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় সে হেঁটেই ঘরে ফেরে! হেঁটে ঘরে ফিরতেই তার বেশি ভালো লাগে।

স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনে মিসেস ইগলস্টোন জেগে উঠলেন। চুপচাপ একটু কান পেতে শোনার পর উনি বুঝতে পারলেন স্বামী কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। কিন্তু সবচেয়ে যেটা ওঁকে বিস্মিত করলো, স্বামী যার সঙ্গে কথা কইছে, সেই তৃতীয় ব্যক্তির কোথাও কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রথমে শঙ্কিত হয়ে ভেবেছিলেন তৃতীয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই ওঁর শোবার ঘরে কোথাও আছে, কিন্তু উদ্ভাসিত জ্যোৎস্নায় ঘরখানা এমন আশ্চর্য উজ্জ্বল যে পাশাপাশি দুটি শয্যায় ওরা দুজন ছাড়া আর কোথাও কেউ নেই।

'এই, শুনছো,' মৃদুভাষে মিসেস ইগলস্টোন বললেন, 'তুমি কি জেগে, না ঘুমিয়ে?'

'অবশ্যই জেগে। ঘুমিয়ে থাকলে কি আর কথা বলতে পারতাম।'

'না, মানে···অনেকে তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলে, তাই ভাবলাম··· অবশ্য আমি তোমাকে কখনও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলতে শুনিনি। তুমি নাক ডাকো ঠিকই, তবে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলো না।'

'সেটা আমি নিজেও জানি যে কখনও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলি না।'

'কিন্তু একটু আগে তুমি কথা বলছিলে, মার্ক!'

'হ্যাঁ, বলছিলাম।'

মিসেস ইগলস্টোন ইতস্তত করলেন, কেননা এ প্রসঙ্গে সরাসরি কিছু জিগেস করাটা অশোভন। তাই উনি চুপ করেই ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ নীরবতার পর স্বামী যখন আবার কথা বলতে শুরু করলো, উনি ভাবলেন এ সম্পর্কে জিগেস করাটা ওঁর কর্তব্য।

'কার সঙ্গে তুমি কথা বলছো, মার্ক?'

'ভগবান।'

'কার সঙ্গে বললে ?'

'ভগবান।'

'না, মানে···আমি ঠিক···'

'আমার ধারণা, আমাকে ভগবানের সঙ্গে কথা বলতে দেখে তুমি খুব অবাক হয়েছো। কিন্তু এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। এর মধ্যে অবাক হবার মতো কিছু নেই।'

'কিন্তু ধরো, মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে তুমি যদি ছ্যাখো আমি ভগবানের সঙ্গে কথা বলছি, তুমি কি অবাক হবে না বলো ?' কিছুটা অভিমান-আহত স্বরেই মিসেস ইগলস্টোন প্রশ্ন করলেন।

'না, একটুও নয়। ঈশ্বর সর্বত্রই। আর উনি যখন তোমার কথা শুনতে পান, তখন তুমিই বা কেন ওঁর সঙ্গে কথা কইবে না ?'

'আমি ঠিক এভাবে কখনও ভেবে দেখিনি।' মিসেস ইগলস্টোন নিজেকে আড়াল করে রাখার ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেও, সদ্য জেগে ওঠা ওঁর সমস্ত ব্যাপারটাই এমন আকস্মিক আর অপ্রত্যাশিত যে চেষ্টা করেও উনি ভাবনাগুলোকে ঠিক মতো আঁকড়ে ধরতে পারলেন না।

'মার্ক ?'

'বলো।'

'তুমি কি সম্পর্কে কথা বলছিলে ?'

'এই নানান সমস্যা, অসুবিধে, ভয়।'

'ও।'

'তুমি তো জানো, আমাদের কত রকমের সমস্যা।'

'জানি, মার্ক।' মন গলানো স্বরে মিসেস ইগলস্টোন বললেন, কেননা উনি জানেন বিশেষজ্ঞকে দেখানোর জন্যে সপ্তায় স্বামীর একশো করে ডলার খরচ হয়। থেরাপির জন্যে সপ্তায় ওই একশো ডলার যদি মার্ককে না খরচ করতে হতো—ওঁর ধারণা বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে কাজের কাজ তো কিছু হয়ইনি, বরং উলটোটাই হয়েছে—তাহলে বেচারি আর্থিক

দিক থেকে কিছুটা স্বস্তি পেতো, তখন হয়তো তার এভাবে প্রায়শ্চিত্ত করার কোনো প্রয়োজনই হতো না।

'মার্ক ?'

'বলো।'

'এ সম্পর্কে জিগেস করছি বলে তুমি কি মনে করছো না তো ?'

'একটুও না।'

'আচ্ছা, উনি তোমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন ?'

'কে, ভগবান ? হ্যাঁ, কখনও কখনও দেন বইকি। আবার অনেক সময় দেনও না।'

'ও !'

'ও বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছো ?'

'কিচ্ছু না। এমনিই বললাম—ও।'

মিসেস ইগলস্টোন ঘুমিয়ে পড়লেন। যেহেতু প্রথম রাতটায় ওঁর ঘুমের কিছুটা ব্যাঘাত ঘটেছিলো. শেষ রাতটায় উনি বেশ গভীর ভাবেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

মিস্টার ইগলস্টোন ইতিমধ্যেই অফিসে বেরিয়ে গেছেন। যদিও মিসেস ইগলস্টোনের হাতে এখনও অনেক সময় আছে, তবু এই সময়ের মধ্যেই ওঁকে স্নান সারতে হবে, সাজগোজ করে পোশাক পালটাতে হবে, কেশ পরিচর্যকের কাছে যেতে হবে, মাধ্যাহ্ন-ভোজের জন্যে 'কলোনি'তে শ্রীমতী ক্যাবটের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তেমন উল্লেখযোগ্য ভাবে কাজের কাজ কিছু না করেই ওঁর সারাটা সকাল এক রকম প্রায় ছুটতে ছুটতেই কেটে যায় এবং এতে উনি নিস্তেজ হয়ে পড়েন। তার ওপর আজ আবার ডাক্তার ভাস্কিভিচের সঙ্গে দেখা করার দিন—অবশ্য এতে যে কোনো লাভ হবে না, সেটাও ওঁর অজানা নয়।

'কি ব্যাপার, আজ কি শরীরটা ভালো নেই ?' খাবারের ফরমাস দেবার পর মিসেস ক্যাবট উদ্বিগ্ন স্বরেই প্রশ্ন করলেন। মিসেস ইগলস্টোনকে উনি ছোট বোনেরই মতো ভালোবাসেন। ওঁরা দুজন

পরস্পরকে যে শুধু পছন্দ করেন তাই নয়, মার্ক এবং আর্থার ক্যাবট একটা সংস্থার অংশীদারও বটে।

'আজকে শরীরটা আমার সত্যিই তেমন ভালো লাগছে না।' মিসেস ইগলস্টোন অকপটেই স্বীকার করলেন। 'ঘুম থেকে উঠতেই দশটা বেজে গেলো, ফলে সকাল থেকে ঘুরতে ঘুরতে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়—তার ওপর আজ আবার সেলুনে চুল ঠিক করার ব্যাপারটা আগে থেকেই পাকা করা ছিলো। গত রাত্তিরে মার্ক এমন একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটালো···'

'তবে তুমি যদি ভেবে থাকো আর্থারের সঙ্গে জীবন কাটানোটা গোলাপ-শয্যার মতো কোনো লোভনীয় ব্যাপার—বিশেষ করে দুই বন্ধুতে বারমুড়া ঘুরে আসার পর থেকে—তাহলে কিন্তু তুমি ভুলই করবে। তা কাল রাতে মার্ক কি কাণ্ডটা ঘটিয়ে ছিলো শুনি?'

মিসেস ইগলস্টোন আগুনে ঝলসানো ছত্রাকের পাত্রটার দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে ছিলেন, মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'আমার মনে হয় তার আগে একটু মার্টিনি নিলে ভালো হোতো।'

মিসেস ক্যাবটের ভাষায় যাকে বলে প্রভাতী মার্টিনি, অর্থাৎ দুভাগ ভারমুখ আর এক ভাগ জিন, তারই ফরমাস দিলেন।

'ব্যাপারটা বিশ্রী না অন্য কিছু, কি ভাবে বলবো ঠিক বুঝতে পারছি না। রাত তিনটের সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে দেখি কি মার্ক কথা বলছে।'

'কার সঙ্গে?'

'ভগবানের সঙ্গে।'

'ও!'

'আমিও ঠিক তাই বলেছিলাম।'

তারপর মিসেস ইগলস্টোন ওঁর বান্ধবীকে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বললেন।

মিসেস ক্যাবট কিন্তু এতটুকুও বিস্মিত হলেন না। 'বললেন, আমাকে

আর কিছু বুঝিয়ে বলার দরকার নেই, আমি সব বুঝতে পেরেছি। আর্থারও ঠিক তাই বলে। গোঁড়া নাস্তিক আমি নিজেও নই, তবে প্রত্যেকেরই একটা শোভনতা বোধ থাকা উচিত। এই তো সেদিন সকালে, প্রাতরাশের সময় ক্যাথি আর জয়ি নিজেদেরই মধ্যে গল্প করছিলো। ক্যাথি বলছিলো ওর নাকি বাড়ির অঙ্ক করা হয়নি. রগচটা মিস বিক্সবে যে কি কাণ্ডটা ঘটাবে ও নিজেও জানে না। তখন আর্থার কি বললে জানো? মেয়েকে বললো, কি আর করবি সোনা, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর। মেয়ে তো অমনি ঝাঁঝিয়ে উঠলো, হ্যাঁ, তোমার ঈশ্বর এসে আমার অঙ্ক করে দিয়ে যাবে, না? আর্থার বললো, উনি যদি বিশাল পাহাড় সরাতে পারেন, তাহলে তোর অঙ্কও করে দিতে পারবেন। মেয়ে বললো, তুমি তো আর বিক্সবেকে চেনো না। ঈশ্বর পাহাড় সরাতে পারলেও, মিস বিক্সবেকে টলাতে পারবে না। অন্য কেউ স্বাভাবিক মানুষ হলে হেসে উড়িয়ে দিতো, কথাটা গায়েই মাখতো না। কিন্তু আর্থার রাগে একেবারে টগবগ করে ফুটতে লাগলো, বললো স্কুলে আজকাল নাকি কমিউনিজম শেখানোর ফলেই এই সব হচ্ছে। তারপর ফরমোসা, চীন, আরও কত কি সব যেন বললো, যার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। শুধু এইটুকু সান্ত্বনা, যেহেতু ক্যাথি এখন বেণ্টেলেতে রয়েছে, উগ্রপন্থীদের হাত থেকে আমাদের কিছুটা রক্ষে। কিন্তু সখী, এই যে সেইটা।'

'কি এটা?' মিসেস ইগলস্টোন অবাক হয়ে গেলেন।

'সেই বইটা, যেটা তুই বন্ধুতে বারমুড়ায় যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলো। তুমি তো জানো—আর্থারের সব সময় ভয় এই বুঝি সে হৃদরোগে আক্রান্ত হলো...'

'আর কোথাও একটু কিছু হলে মার্কের ভয় তার বোধ হয় ক্যান্সার হয়েছে।'

'ওদের দুজনেরই উচিত আবার বারমুড়ায় চলে গিয়ে আমাদের একটু শান্তিতে থাকতে দেওয়া। নইলে বাবুরা বাতাসে বুনো জই রুইবেন, আর আমাদের তা ঝাড়াই-মাড়াই করতে করতেই জান বেরিয়ে যাবে।'

'সত্যিই তাই।'

'তা নয়তো কি। মার্ক রাত্তিরে জেগে উঠে ভগবানের সঙ্গে কথা কইতে পারে, কিন্তু তার স্ত্রী তার কাছ থেকে কোনো দিনও একটা সত্যি কথা শুনতে পাবে না। আর্থার অবশ্য আলাদা। ও নিজে থেকেই আমাকে এই বইটা দিয়েছে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। ওঁদের অফিসের সেই লোকটা—স্ট্রায়াস, না স্ট্রিকল্যাণ্ড না কি যেন নাম লোকটার, যে চারবার বিয়ে করেছে, আর নিচের ঠোঁটটা যার সব সময়েই কাঁপে···'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে।'

'ওই লোকটাই আর্থার আর মার্ককে "পরম চিন্তার ক্ষমতা" বইটা উপহার দিয়েছিলো আর ওরা দুজন বারমুডায় যাওয়া আসার সারাটা পথ একে অন্যকে জোরে জোরে পড়ে শুনিয়েছে—ঠিক যেন দুটি মানিক-জোড়। আর্থার দুবেলা খাওয়ার আগে তো বটেই, এমন কি দাড়ি কামানোর আগেও কমসে কম দশ মিনিট ধরে প্রার্থনা করে।'

মিসেস ইগলস্টোন জিগেস করলেন, 'ও-ও কি রাত্তিরে কথা বলে?'

'বলে হয়তো আস্তে আস্তে।'

'তুমি বইটা পড়েছো?'

'না, তাছাড়া আমার পড়ার কোনো ইচ্ছেও নেই।' মিসেস ক্যাবট বেশ জোর দিয়েই কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই মিসেস ইগলস্টোন আবিষ্কার করলেন ডাক্তারের কাছে যাবার আর মাত্র কুড়ি মিনিট বাকি আছে। যেহেতু ডাক্তার ভাস্কিভিচ ৮৩ তম পার্ক এভিনিউ-এ থাকেন, ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে 'কলোনি' থেকে সারাটা পথ ওঁকে আবার সেই একই তাড়াহুড়ো করতে হবে। ট্যাক্সির জন্যেও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো, শেষ পর্যন্ত যখন পৌঁছলেন, তখন মিনিট দুয়েক দেরি হয়ে গেছে।

দুমিনিট দেরিটা নিশ্চয়ই তেমন মারাত্ম কিছু নয়, কিন্তু মিসেস ইগলস্টোন ভালো করেই জানেন যে সময়ের ব্যাপারে ডাক্তার ভাস্কিভিচ অসম্ভব কড়া, এক চুলও এদিক ওদিক হলে রেগে যাবেন। ডাক্তার ভাস্কিভিচকে মিসেস ইগলস্টোন যেমন শ্রদ্ধা করেন, ওঁর ওপর নির্ভরও করেন ঠিক তেমনি ভাবে। গত চার বছর ধরে উনি ওঁকে দেখাচ্ছেন, এই চার বছরের মধ্যে কেবল একবারই ওঁর বিশ্বাসে চিড় ধরেছিলো, যখন উনি ওঁর পরিচিত এক বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে ডাক্তার ভাস্কিভিচের প্রকৃত নাম হ্যারি সিম্পকিনস্ এবং ক্লাউয়ার হাসপাতাল থেকে পাশ করেছিলেন। সেই সময়, অন্তত মাস খানেকের জন্যে, তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতিতে ওঁর কোনো উন্নতি ঘটেনি। পরে অবশ্য ডাক্তারের কাছে বশ্যতা স্বীকার করার ফলে উনি নিজেই নিজের সমস্যা অনেকটা সুরাহা করতে পেরেছিলেন, স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন একজন কৃতী মনোবিজ্ঞানী হতে গেলে উপযুক্ত নাম এবং আদবকায়দার কত প্রয়োজন।

আজ যেহেতু দেরি করে ফেলেছেন, ডাক্তার ভাস্কিভিচের কাছ থেকে অভ্যর্থনার কোনো বাণীই ওঁনার কানে এসে পৌঁছলো না। শুধু ইঙ্গিতে তিনি গদিআঁটা নরম কুর্সিটার দিকে নির্দেশ করলেন, তারপর নিঃশব্দে নিজে গিয়ে বসলেন কুর্সির পেছনের একটা আসনে। নিজেকে এমন নিঃসঙ্গ আর হারিয়ে যাওয়া মানুষের মতো মনে হচ্ছিলো যে মিনিট পাঁচেকের বেশি কুর্সিতে গা এলিয়ে দিয়ে মিসেস ইগলস্টোন চুপচাপ পড়ে রইলেন, একটা কথাও বলতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার ভাস্কিভিচই প্রথম গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন:

'আশা করি আজ আপনার দেরি না করে কোনো উপায় ছিলো না?'

এতেই উৎস মুখটা খুলে গেলো। 'হ্যাঁ, ডাক্তার ভাস্কিভিচ, অসম্ভব তাড়াহুড়োর মধ্যে সারাটা দিন আমার প্রায় ছুটতে ছুটতেই কেটে গেছে। আপনি তো জানেন এতে আমি কি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ি।' কথা বলতে

বলতে মিসেস ইগলস্টোনের চোখে তখন প্রায় জল এসে গিয়েছিলো।
'জানেন মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, এভাবে ছুটতে ছুটতে আমি একদিন ঠিক টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বো, ছড়িয়ে পড়বো এখানে ওখানে, তারপর আমার আর কোথাও কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।' সব শেষে মিসেস ক্যাবটকে যতটা না বুঝিয়ে বলতে পেরেছিলেন, তার চাইতে আরও বিশদভাবে ডাক্তারকে সবকিছু খুলে বললেন।

'কিন্তু আপনার স্বামী যদি ভগবানের সঙ্গে কথা বলেই থাকেন, এতে এত বিব্রত বোধ করার কি আছে?' সব শোনার পর ডাক্তারই প্রথম প্রশ্ন করলেন।

'কিন্তু ও আগে কখনও বলতো না, ডাক্তার ভাস্কিভিচ।'

'যে উদ্দেশ্যে আজ আপনি এখানে চিকিৎসা করতে আসছেন, সেই অভ্যেস বা ভাবনাও তো আগে আপনার ছিলো না, মিসেস ইগলস্টোন?'

'কিন্তু একটা জিনিস, ভগবান যদি ওর কথা শুনেও থাকেন, জবাব তো দিতে পারেন না। কিন্তু ও এমন ভাবে তাঁর সঙ্গে বলে যেন তিনি জবাব দিচ্ছেন...'

'এখানেও তো আপনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে যান, মিসেস ইগলস্টোন, অথচ আমি কখনও জবাব দিই, কখনও দিই না।'

'এখানকার কথা আলাদা। আমি অবশ্য ওকে অনুরোধ করেছি একজন ভালো মনোবিজ্ঞানীকে দেখাতে...'

'কিন্তু উনি তা পারেন না,' অত্যন্ত শোভন ভঙ্গিতেই ডাক্তার ভাস্কিভিচ ধীরে ধীরে বলে চললেন, 'আপনার অনুরোধে কোনো ফল হবে না, মিসেস ইগলস্টোন। উনি চলেন ওঁনার পথে, আপনি চলেন আপনার পথে। ওঁনার ব্যাপারটা বুঝতে গেলে আপনাক অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে হবে।'

মিসেস ইগলস্টোন সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত নন যে উনি বুঝতে পেরেছেন,

কিন্তু যখন কুর্সি থেকে উঠে দাঁড়ালেন, বিশেষ করে ডাক্তার ভাস্কিভিচের ঘর ছেড়ে যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন, নিজেকের ওঁর ঠিক পাখির পালকেরই মতো হালকা মনে হলো। ওঁর পেছনে পড়ে রইলো সারা দিনের ত্রস্ত্র পথ চলা। উনি হেঁটে চললেন ম্যাডিসন এভিনিউ-এর দিকে, ম্যাডিসন এভিনিউ অতিক্রম করে এলেন, অত্যন্ত পরিচিতের মতো উচ্ছল খুশিতে পেরিয়ে গেলেন ৫৯ তম সরণী—যার প্রতিটা দোকান, প্রতিটা মুখ, প্রতিটা পদক্ষেপই ওঁর আশ্চর্য চেনা। ডাক্তার ভাস্কিভিচকে সবকিছু খুলে বলার পর থেকে নিজেরই ওঁর এত ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে ঠিক যেন গুটি থেকে সদ্য মুক্তি পাওয়া কোনো প্রজাপতির মতো।

মর্যাদা

প্রথমে আমাদের রাখা হলো বড় একটা লোহার খাঁচায়। মনে হলো এ অসম্ভব, কেননা তোমার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় আপাত দৃষ্টিতে যা ন্যায়-সঙ্গত, তার বিরুদ্ধে কিছু করা হলে তোমার সব সময়েই তা অসম্ভব মনে হবে। কোনো মানুষ বাস করে দুটো পৃথিবীতে। একটা তার নিজের পৃথিবী—যার স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ সে পায়, যাকে সে দেখতে আর শুনতে পায়। অন্য পৃথিবীটার অস্তিত্ব কেবল তার স্বপ্নে, কাহিনীতে, সংবাদপত্রে, মঞ্চে কিংবা চলচ্চিত্রে। যখন তুমি সুনিশ্চিত হয়ে উঠবে যে এ পৃথিবীটা কখনও ছিলো না, কখনও হবে না। তখন নিজেকে সেই পৃথিবীর অবিচ্ছেদ্য একটা অংশ ভাবতে তোমার নিজেরই কেমন অবিশ্বাস্য মনে হবে।

আমাদের রাখা হয়েছে একটা লোহার খাঁচায়, দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগানো। আমরা এগারো জন। এখন কিংবা একটু আগে পর্যন্তও ছিলাম ব্যস্ত মানুষ, যাদের জীবন নানান বৈচিত্র আর দিনের প্রতিটা ঘন্টাই ছিলো অজস্র পরিকল্পনা দিয়ে ঠাসা। এখন আর পরিকল্পনা করার কিছু নেই, ভবিষ্যৎও অস্পষ্টতায় ভরা। আমাদের বলা হয়নি কেন খাঁচায় পোরা হলো, কতক্ষণ আমাদের এখানে থাকতে কিংবা পরেই বা আমাদের নিয়ে কি করা হবে। তার চাইতেও বড় কথা, এইসব প্রশ্ন জিগেস করার অধিকারটুকুও আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

খাঁচাটা প্রায় ত্রিশ বর্গফুট। তার মধ্যে রয়েছে কয়েকটা বেঞ্চি পাতা এবং অন্য আরও দশ-বারোজন মানুষ। আমরা হাসিখুশি থাকার ভান করলাম, হাসলাম, পরস্পরের মধ্যে সামান্য দুচারটে কথাও বললাম। কিন্তু আগে থেকেই যারা ওখানে ছিলো, তারা কেউ হাসলো না বা কথা

বললো না। ওদের অধিকাংশ মুখই দেখলাম গভীর হতাশায় ভরা, কয়েক দিনের না কামানো দাড়ি, জীর্ণ মলিন পোশাক, কারো বা পোশাক আবার শতছিন্ন। ওদের মধ্যে দুজনকে আবার বিশ্রী ভাবে মারা হয়েছে, সারা মুখ জুড়ে কালশিটে দাগ আর শুকিয়ে যাওয়া চাপ চাপ রক্ত। আমাদের চোখে মুখে তখনও যেটুকু কৌতূহল উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিলো, কিন্তু আগে থেকে যারা ওখানে রয়েছে, নিভে যাওয়া সেইসব মানুষগুলোর চোখে মুখে আগ্রহের কোথাও কোনো চিহ্ন নেই।

খাঁচার মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে, কেউ বা বসে—আর সময় বয়ে চলেছে তার আপন খেয়ালে। একটু একটু করে, প্রায় চোখের অলক্ষ্যেই আমরাও আগের লোকগুলোর মতো হয়ে গেলাম। সম্ভবত সেটা উপলব্ধি করতে পেরে, একে একে ওরাও আমাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো। ওরা প্রায় সবাই জানতে চাইলো আমরা কি করেছি। কেননা ডাক্তার, আইনজীবী, শ্রমিক-নেতা, অধ্যাপক আর সাহিত্যিকের এই যে ছোটখাটো দলটা এরা কোন্ ধরনের অপরাধ করতে পারে সেটা কিছুতেই ওদের মাথায় ঢুকছিলো না। ডাক্তাররা অসুস্থদের সারিয়ে তোলেন, আইনজীবীর ন্যায়ের মর্যাদাকেই প্রাধান্য দেন, শ্রমিকদের স্বার্থে যা করনীয় শ্রমিক-নেতারা তাই করে যান, শিক্ষকরা আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করেন আর আমাকে যে লোকটা প্রশ্ন করেছিলো, আমি তার জবাবে বললাম—কংগ্রেসের সভায় আমাকে বন্ধুদের নাম বলতে বলা হয়েছিলো, আমি তাদের নাম বলিনি।

'ও, তার মানে আপনি লাল।' লোকটা বললো।

'হ্যাঁ, আমরা লাল।'

একটা জিনিস আমরা আবিষ্কার করলাম—বন্দীরা সবাই খুব নম্র। হয়তো সমস্ত মানুষই নম্র, হয়তো তাদের জীবনে কখনও কিছু ঘটে, যার ফলেই তারা অন্য রকম হয়ে ওঠে। কিন্তু তুমি যখন তাদের খাঁচায় বন্দী করে রাখো, ছিনিয়ে নাও তাদের আশা, মর্যাদা, আগামী কালের যা কিছু প্রত্যাশা, তখন তাদের সমস্ত অবয়বে ফুটে ওঠে একটা করুণ সরলতা,

যা সুপ্ত থাকে তাদেরই সত্তার গহন নিভৃতে। কিন্তু অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে। কেননা মানুষের যাকিছু মানবিক বোধের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে স্বাধীনতারই মধ্যে, তাদের খাঁচায় বন্দী করে রেখে নয়।

খাঁচার মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি, কেউ বা বসে রয়েছি, আর সময় বয়ে চলেছে, সময় পালটে যাচ্ছে। সময় যে পালটাচ্ছে সেই জিনিসটাই আমরা প্রথম আবিষ্কার। কেননা এখানে আসার ঠিক আগের মুহূর্ত পর্যন্তও আমাদের জীবনে সময় ছিলো স্বর্নীল, দুর্লভ বস্তুর মতো। এখানে আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্তও সময়কে মাপা হতো আমাদের অস্তিত্বের কত না সেকেণ্ড, কত না মিনিট, কত না ঘণ্টা দিয়ে, আর সেই পরিমিত সময়ের মধ্যেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো আমাদের বিশ্ব, আমাদের জীবন-মৃত্যু, উচ্ছলতা, ভালোবাসা, আমাদের শ্রম, সংগ্রাম, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, আমাদের অভিজ্ঞতা। কিন্তু এখন সময় বদলে গেছে, বয়ে চলেছে ভিন্ন মুখে। প্রতিটা সেকেণ্ড এখন শত্রু, প্রতিটা মিনিট বিশ্বাস-ঘাতক, প্রতিটা ঘণ্টা ঘৃণ্য হন্তারক। এখানে সময়ের কোনো কাজ নেই, কোনো প্রয়োজন নেই, কোনো উদ্দেশ্যও নেই—কেবল আমাদের শত্রু হিসেবে সে নিজেই নিহত হচ্ছে, বিধ্বস্ত হচ্ছে, উধাও হয়ে যাচ্ছে।

এখানে আসার আগে পর্যন্তও আমাদের অনেক কিছুর বিরুদ্ধে সংগ্রান করতে হয়েছিলো, কিন্তু এখন আমাদের একটাই মাত্র শত্রু—সময়ের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

সময় গড়িয়ে গেছে দুপুরে। ওরা আমাদের খাঁচার মধ্যে স্যাণ্ডউইচ ছুঁড়ে দিলো, ঠিক যেমন পশুশালায় জন্তুদের খাঁচার মধ্যে মাংস ছুঁড়ে দেওয়া হয়। স্যাণ্ডউইচগুলো কাগজে মোড়া ছিলো, কিন্তু আমরা যখন খুললাম, দেখলাম বেশ কয়েক দিনের বাসী, দুটুকুরো রুটির মধ্যে ছাতা-পড়া কি যেন একটা। আমাদের তেমন খিদে ছিলো না, স্যাণ্ডউইচগুলো অন্যদের দিয়ে দিলাম। কিন্তু ক্রুদ্ধ চাপা একটা বিতরাগ ছড়িয়ে পড়লো

আমাদের প্রতিটা শিরা-উপশিরায়, কেননা মানুষের অত্যন্ত স্বাভাবিক যা প্রত্যাশা, সেটাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

আবার আমরা সময়ের দিকে ফিরলাম, সময়ের মুখোমুখি দাঁড়ালাম। প্রথম প্রথম যতটা কঠিন মনে হয়েছিলো, পরে দেখলাম সময়ের সঙ্গে সংগ্রাম করাটা তত কঠিন নয়। সময় কিন্তু আপন খেয়ালেই বয়ে চললো, এবং শেষ পর্যন্ত এমন একটা সময় এলো যখন ওরা খাঁচার দরজাটা খুলে দিলো। দুজন দুজন করে হাতকড়া পরিয়ে ওরা আমাদের বাইরের লম্বা ঢাকা-বারান্দাটায় সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিলো। দুপাশের দেওয়াল দুটো অনেক দিনের পুরনো, নোংরা, হলদে রঙ করা।

আমার ঠিক পাশেই দাঁড়ানো কলেজের অধ্যাপকটির কাছে মন্তব্য করলাম, হাতে এইভাবে হাতকড়া পরানো অবস্থায় নিজেদেরকে মানুষ ভাবাটা সত্যিই কঠিন।

'তবু আপনি আপনার মর্যাদাকে বজায় রাখতে পারেন,' উনি জবাব দিলেন।

শব্দটা আমার কাছে কেমন যেন অদ্ভুত রহস্যময় বলে মনে হলো, কিন্তু তার মানে এই নয় যে শব্দটা এর আগে কখনও শুনিনি বা ভাবিনি। এখন রহস্যময় মনে হচ্ছে যেহেতু শব্দের প্রকৃত অর্থটাকে এমন সতর্কতার সঙ্গে এর আগে আর কখনও ভেবে দেখিনি। মনে মনে স্বীকার করলাম, মানুষের জীবনে মর্যাদার ভূমিকা সত্যিই অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ, যার ওপর নির্ভর করে ভাবনার চরম উৎকর্ষতা।

খাঁচা আর ঢাকা-বারান্দার অস্পষ্ট গোধূলিমা থেকে আমাদের নিয়ে আসা হলো দিনের স্পষ্ট আলোকে। রাইফেল উঁচিয়ে ধরা দুসারি প্রহরী-প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে আমরা হেঁটে চললাম, দুজন দুজন করে সার বেঁধে গিয়ে উঠলাম অপেক্ষমান একটা বাসে। কিন্তু সেটাও একটা খাঁচা বিশেষ—চারদিকেই লোহার গরাদের ওপর মোটা তারের জাল দিয়ে ঘেরা। দরজার সামনে বসে রয়েছে সশস্ত্র প্রহরী। আমরা ভেতরে গিয়ে বসলাম, দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দেওয়া

হলো, তারপর বাসটা শহরের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললো বন্দীশালার দিকে।

বন্দীশালায় পৌঁছতে গিয়ে আমাদের প্রায় সারাটা শহরই অতিক্রম করতে হলো। শহরটা আমাদের খুবই পরিচিত, অথচ সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য মনে হলো। বাসে ওঠার সময়ে ওদের পাগলামির বহর দেখে মনে মনে না হেসে পারিনি, কেননা বাস্তব জীবনে এর চাইতে নির্মম বিদ্রূপ আর কিছু হতে পারে না। আমেরিকার ভাবধারার যে অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য আমরা তার মধ্যে থেকেই উঠে এসেছি, শৈশবে হাজারো বার নিশানের প্রতি জানিয়েছি আমাদের আনুগত্যের দীপ্ত অঙ্গীকার, স্বাধীনতা আর মুক্তির ঐতিহ্যে উদ্বুদ্ধ করেছি নিজেদের —অন্তত যতদিন পর্যন্ত না ওরা নিজেরাই নিজেদের খুশি মতো আমাদের ভাবনা, আমাদের চেতনা, আমাদের প্রতিক্রিয়াকে নির্দিষ্ট একটা রূপ দেবার চেষ্টা করেছে। ওরা যখনই আমাদের ভাবনায় ওদের ভাবনাকে আরোপিত করার চেষ্টা করছে, তখনই তার বিরুদ্ধে আমরা আমাদের জীবনকে রূপ দিয়েছি প্রাচীন ঐতিহ্যের আলোকে। আমরা ছিলাম স্বাভাবিক মানুষ, হয়তো আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে থাকা উচিত নয়, তবু আমরা যা কিছু শিখেছি, আমাদের নৈতিকতার সেই প্রথম শ্রষ্টা আমাদের এই দেশ। সুতরাং, আজ আমাদের জীবনে যা ঘটতে চলেছে —তা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনই হাস্যকর। আমাদের অপরাধ শুধু এক-নায়ক ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে যে সব স্প্যানিয়ার্ডরা স্পেনের প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্যে বুকে বুক দিয়ে সংগ্রাম করেছিলো, তাদের নাম ফাঁস করে দিইনি।

কিন্তু এই ধরনের কাজের জন্যে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের মানুষকে কখনও জেলে পাঠানো হয়নি—কেননা আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের জীবন-সত্তার প্রতিটা তন্ত্রীই আমাদের খুব ভালো করে জানা, বরং এই ধরনের কাজের জন্যে একদিন মানুষকে সম্মানিতই করা হয়েছে। অথচ আজ আমরা চলেছি কারাগারে।

প্রথমটায় কিছুক্ষণের জন্যে আমরা হেসেছিলাম, কিন্তু পরে আর হাসিনি।

কলম্বিয়া প্রদেশের ওয়াশিংটন শহরটা তখন প্রথম গ্রীষ্মের উজ্জ্বল সূর্যালোকে ঝলমল করছে। যতটা সবুজ হওয়া সম্ভব গাছের পাতাগুলো তার চাইতেও সবুজ। বড় বড় সাদা বাড়িগুলোতে প্রতিফলিত হচ্ছে সূর্যের আলো। পর্যটকরা ক্যামেরা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মেয়েরা গ্রীষ্মের হালকা পোশাক পরে রাস্তায় বেরিয়েছে, বাচ্চারা হাসছে। আর আমরা এগিয়ে চলেছি কারাগারের পথে।

পথচারীদের কেউ কেউ আমাদের দিকে তাকাচ্ছে, তা বলে অনেকে নয়, আর যারা তাকাচ্ছে তারা আমাদের দেখছে না। অপরাধীরা সত্যিই হতভাগ্য, আর হতভাগ্যদের খুব কম লোকই দ্যাখে—বিশেষ করে যারা সুখী মানুষ, এবং ওরা সেই সুখী মানুষদেরই অন্যতম। সেই প্রথম এই ভাবনাটা আমার মাথায় এলো। খাঁচায় বন্দী মানুষের কাছে যারা খাঁচায় বন্দী নয় তারা সবাই সুখী। সুখের জন্যে আর অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই—কেবল আমাকে ছেড়ে দাও, তাহলেই আমি সুখী হবো। যেখানে খুশি আমাকে হাঁটতে দাও, যেখানে মন চায় যেতে দাও—তাহলেই আমি সুখী হবো। ব্যাস, তার বেশি আর কিছু চাই না।

বাসে পৌছতে প্রায় মিনিট পনেরো সময় লাগলো। কারাগারটা শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে। দীর্ঘ, উঁচু পাঁচিল ঘেরা লাল ইটের প্রকাণ্ড একটা বাড়ি, যেন হতাশা আর কদর্যতার এক বিরাট ধ্বংসস্তূপ। বাসটা পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে ফটকটা খুলে গেলো, তারপর বাস সমেত ভেতরে প্রবেশ করার পর ফটকটা আবার বন্ধ হয়ে গেলো। বাস থেকে নামার পর আমাদের হাতকড়া খুলে দেওয়া হলো। সেখানেও সশস্ত্র প্রহরীদের কড়া পাহারা। বিদ্যুৎ-চালিত স্বয়ংক্রিয় একটা দরজা একপাশে সরে গেলো, আমরা প্রবেশ করলাম অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা গলি-পথে, যেখানে বৈদ্যুতিক চোখের সাহায্যে আমাদের সর্বাঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হলো। সুড়ঙ্গপথটার প্রতি পদক্ষেপেই মনে হতে লাগলো

বৈদ্যুতিক দরজাগুলো সরে যাচ্ছে এবং সেটাকে অতিক্রম করে যাওয়ার পরক্ষণেই আবার বিশ্রী শব্দ তুলে যথাস্থানে ফিরে আসছে। প্রকৃত পক্ষে আমরা তখন এমন একটা জায়গা দিয়ে চলেছি, যেখানে কেবল একজন করেই এগুতে পারে, ফেরার কোনো পথ নেই।

এক সময়ে আমরা একটা কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সেখানে আমাদের বলা হলো পকেটে যা কিছু আছে সমস্ত জমা দিতে। সময় যখন মিত্র বা বন্ধু নয়, এমন কি একটু স্বস্তিও দেবে না, তখন ঘড়ি খুলে ফেলতে, কিংবা সঙ্গে আনা দাঁত মাজার ব্রাস, দাড়ি কামানোর সরঞ্জামের মতো ব্যক্তিগত তুএকটা জিনিসও জমা দিতে কোনো আপত্তি নেই। সঙ্গে যা ছিলো সবই জমা দিলাম, কিন্তু ঘরের চাবি বা তুএকটা বই সঙ্গে রাখতে দিলে সত্যিই বেশ ভালো হতো, অথচ এখানে সে রকম নিয়ম নেই। এর বিরুদ্ধে তর্ক বা প্রতিবাদ করাও অর্থহীন।

'এবার সামনে এগিয়ে যান,' ওরা নির্দেশ দিলো। 'আপনাদের যা বলা হচ্ছে তাই করুন।'

প্রতিরোধের ক্ষীণ আশাটুকুও নিশ্চিহ্ন। এবার তোমাকে নগ্ন হতে হবে। আর তোমার চারপাশে—অস্ত্রের ঝনঝনা, ক্ষমতা, শক্তি, উদ্ধত্য, এবং সবার ওপরে যাঁর স্থান, সেই ঘৃণা।

এর আগে ঘৃণার এমন রূপ জীবনে আমি কখনও দেখিনি বা অনুভব করিনি। আগের দিনও আমি ছিলাম একজন মানুষ এবং মানুষের নূন্যতম যে সম্মান সেটুকু পেয়ে এসেছিলাম। সম্মানই পারে মানব-সমাজকে আঁকড়ে রাখতে—সাধরণত সব মানুষই যা পোষণ করে, অন্যের সেই আশা-আকাঙ্খা, তুঃখ-বেদনা আর দক্ষতার প্রতি সম্মান; সম্মান ভাতৃত্বের প্রতি, যা পরস্পরকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে রাখে। এখানে বিজলী-ফটক মানুষের সেই ভাতৃত্বকে সম্পূর্ণ আড়াল করে রেখেছে। এখানে, কারাগারের এই বাসিন্দাদের জন্যে কোনো সম্মান নেই, ছিটেফোঁটাও সম্মান নেই, কেবল ঘৃণা—সুরক্ষিত উদ্বিগ্নতার সঙ্গে মেশা তীব্র একটা ঘৃণা স্মরণ করিয়ে দেয় ওরা বিপজ্জনক

পশু। এই বোধটা আমরা আগে থেকে অনুভব করতে পারিনি, কারাগারে পাঠানোর পর সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ঘৃণার মুখোমুখি না দাঁড়ালে কেউ কোনোদিন তা অনুভবও করতে পারবে না।

নগ্নতা সম্পর্কেও আমার আগে কোনো ধারণা ছিলো না। পোশাক সম্পর্কে বিতর্ক করা যেতে পারে, এমন কি নগ্নতার প্রতি অনুরক্ত এমন কিছু মানুষেরও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে এই যে পোশাক পরে আসছে, এ তো তারই প্রতীক যা পশুদের থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

এবার এগিয়ে চলুন, ওরা বললো। আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেলো আর একটি বৈদ্যুতিক দরজা। দরজার ওপারে স্বল্পালোকিত দীর্ঘ একটা পথ, পথের শেষে উজ্জ্বল আলোকিত একটা ঘর, যেখানে সম্পূর্ণ নগ্ন জনা পঞ্চাশেক মানুষ—এত দূর থেকেও যাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, নগ্নতার চরমতম লজ্জায় বিশীর্ণ ম্লান, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে, কেউ বা গুটিসুটি হয়ে রয়েছে এক কোণে, দুর্মর লজ্জাকে ঢাকার চেষ্টা করছে হাত দিয়ে। এ এক অন্য পৃথিবী, এ যেন নরক-যন্ত্রণার এক চিত্রিত রূপক—যা জার্মানীর কসাইখানার স্মৃতিকেই স্মরণ করিয়ে, যেখানে সার কিংবা সাবান বানাবার জন্যে মানুষকে মারার আগে তাদের সমস্ত জামা-কাপড় খুলে নেওয়া হতো। সমস্ত দৃশ্যটাই এমন আকস্মিক, এমন আতঙ্কজনকভাবে আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো যে মনে মনে আমি সত্যিই সঙ্কুচিত হয়ে উঠলাম, অনড় পা দুটোকে যেন আর কিছুতেই টেনে নিয়ে যেতে পারছি না। অন্য বন্ধুদেরও মুখে দেখলাম আমার মতো একই প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন।

পথের শেষ প্রান্তে আমরা যখন সেই উন্মুক্ত প্রাঙ্গনটায় এসে পৌছলাম, সেখানে নগ্ন মানুষেরা ভিড় করে রয়েছে, একজন প্রহরী এসে আমাদের বললো, জামা-কাপড় সব খুলে ফেলতে। কেবল

আমারই বয়েস তখন যা পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি, কিন্তু আমার অন্যান্য সঙ্গীরা সবাই পঞ্চাশ অতিক্রান্ত—প্রত্যেকেই প্রবীণ, প্রত্যেকেই মর্যাদা-সম্পন্ন মানুষ—তিনজন খ্যাতনামা চিকিৎসক, একজন অধ্যাপক, একজন আইনজীবী, অন্যরাও কোনো না কোনো দিক থেকে সমাজ-জীবনে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত—প্রত্যেকেই যাঁরা নম্র, ভদ্র, সাহসী, যাঁরা নৈতিক আদর্শকে সবার ওপরে স্থান দেন, তাঁদেরকে বলা হলো পোশাক খুলে ফেলতে। তাঁরা তাই করলেন। কারা-প্রহরীর বিদ্বেষ-ভরা হিমেল দৃষ্টির সামনে সবাই নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বন্দীশালায় কিছুই দ্রুত এগোয় না, গতিময়তা কেবল মুক্ত মানুষের জন্যে। বন্দীশালায় সময় ছাড়া আর সবকিছুরই অভাব। নগ্ন অবস্থায় আমরা প্রায় ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে রইলাম। মানুষ যে তাও সহ্য করতে পারে একদিক থেকে শুভ! অসহায়তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায়, নতুন যে পৃথিবীটাতে সে প্রবেশ করেছে তার চরিত্রকে উপলব্ধি করার অবকাশ পাক।

অবশেষে অবজ্ঞা আর ঘৃণা মেশানো স্বরে প্রহরীদের আদেশ শোনা গেলো:

'এখানে আসুন!'

'ওদিকে যান!'

'এ প্রশ্নের জবাব দিন। তার পরেরটা বলুন!'

'এবার এখানে আসুন।'

বন্দীশালা নিঃসন্দেহে অশুভ জায়গা, কিন্তু তার চাইতেও অশুভ সেইসব মানুষ যারা বন্দীশালায় কাজ করে, অন্য মানুষকে খোঁয়াড়জাত করে রাখা খাঁচাগুলোকে যারা পাহারা দেয়, তাদের মানসিকতা। বেশ কিছুদিন পরে, আমি যখন অন্য একটা জেলখানায় বন্দী ছিলাম, সেখানকার কারারক্ষীকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলাম। লোকটা ঠিক অন্যদের মতো নয়, কিছুটা বুঝদার, অকপটেই সে স্বীকার করেছিলো:

'স্বেচ্ছায় কে আর কারারক্ষী হতে চায় বলুন? আপনি কখনও এমন কোনো মানুষের খোঁজ পেয়েছেন কি যে নিজে থেকে কারারক্ষী হয়েছে?'

আমলাতন্ত্রী মানুষদের অবজ্ঞা এক জিনিস, কিন্তু কারারক্ষীদের অবজ্ঞা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এ অবজ্ঞা এমনই অদ্ভুত আর বিচিত্রধর্মী, যা অন্য কারুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। নিষ্ঠুর, ঘৃণ্য, ক্ষুদ্র মানুষের অবজ্ঞা, যাদের ক্ষমতা অসীম—অন্য মানুষের জীবন-মৃত্যুও নির্ভর করে যাদের হাতে। এরা সেইসব অজ্ঞ মানুষ যারা প্রতিভাদীপ্ত মানুষদের ওপর কতৃত্ব করতে পারে, আদেশ দিতে পারে, ধ্বংস করে দিতে পারে—এরা সেইসব দুর্বল মানুষ, যারা বলিষ্ঠ মানুষদের ওপর কর্তৃত্ব করা ক্ষমতা রাখে, এরা ভীরু যারা সাহসী মানুষদের আদেশ দেয়। মানবিক গুণের অধিকারী অথচ অসহায় মানুষদের প্রতি যারা নির্মম, উদাসীন—এ অবজ্ঞা সেইসব অক্ষম, অমানুষদের। হয়তো অন্য জায়গায় এ অবজ্ঞার রূপটা ভিন্ন রকম, কিংবা হয়তো এখানেও একদিন এর পরিবর্তন ঘটবে, কিন্তু আজকের দিনে এটা কারাগারের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। যারা বলে, উন্মুক্ত আলো-বাতাস আর সমাজ থেকে কাউকে ছিনিয়ে এনে দীর্ঘদিনের জন্যে কারারুদ্ধ করে রেখে দিলে সে অন্য রকম কিংবা আরও ভালো হয়ে উঠবে—বর্বরতা ছাড়া তাদের ভাবনার আর অন্য কোনো যৌক্তিকতা নেই।

প্রতিটা কারাগারই এক একটা নিজস্ব পৃথিবী, আর সেই পৃথিবীতে আমরা নগ্ন হয়ে হেঁটে চলেছি। এবারেও দেখলাম আমি হেঁটে চলেছি সেই অধ্যাপকের পাশাপাশি, যিনি অগাধ পাণ্ডিত্য আর মননের অধিকারী, যিনি একটু আগেই আমাকে মর্যাদার কথা বলেছিলেন, যিনি শুভ্র-ত্বকের নগ্নতায় এখন সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন। আমরা লুকিয়ে রয়েছি—কোণায়, খাঁজে-খোঁজে, অন্ধকার জায়গায় আমরা নিজেদেরকে আড়াল করে রেখেছি। কিন্তু আমাদেরকে জীবাণুনাশক ফোয়ারার ধারা, হিম-স্নান, উষ্ণ-স্নান প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে সমানে

এগিয়ে যেতে হচ্ছে। অবশেষে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো বিবর্ণ হয়ে আসা নীল ডোরা-কাটা কয়েদীর পোশাক, যাকে বলা যেতে পারে প্রাথমিক স্তরে সরকারী 'শাস্তির'-র প্রতীক।

এবং আবার একটু একটু করে মর্যাদা—দু পায়ে হাঁটার, মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর, সুসংগঠিত সমাজে সবচেয়ে বড় অবদান, মানব জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ায় যে মর্যাদা—সেই মর্যাদা আবার ধীরে ধীরে ফিরে আসতে শুরু করলো। এর আগেও এসেছে, বরাবরই আসবে এবং এমন একটা সময় আসবে, যখন আমিও চিনতে পারবো—নির্যাতীত, ভগ্ন, বিধ্বস্ত মানুষের মর্যাদা, কোনো রাজবন্দী কখনও প্রবেশ করার আগে পর্যন্তও যেসব মানুষের পৃথিবীটা ছিলো কারাগারেরই একটা নিজস্ব পৃথিবী।

মিস্টার ফেদারবির ইঙ্গিতে মিস্টার নিউটন বসে পড়লেন। ফেদারবি আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন লুথার নিউটন বলিষ্ঠ হাতদুটো কোলের ওপর ভাঁজ করে রেখে ঠিক একটা বাচ্চার মতো চুপটি করে বসে রয়েছেন। ওঁর গোলগাল মুখখানা কেমন যেন বিষণ্ণ, চোখদুটো সংবেদনশীল আর মর্মস্পর্শী। উনি যখন হাসলেন, বিশ্রী, ভাঙা ভাঙা, বিবর্ণ দাঁতগুলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। উনি একবারই মাত্র হেসেছিলেন। তারপর আর হাসেননি। ওঁর মুখখানা বৈশিষ্ট্যহীন, অত্যন্ত সাদাসিধে ধরনের; চোয়ালের হাড়ের গঠনও এমন যে তা থেকে উল্লেখযোগ্য কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। ত্বকে খুব অস্পষ্ট ছোপ ছোপ দাগ, হালকা ধূসর চোখ, চোখের পাতা-দুটো ম্লান, ঢালু কপাল, পাতলা হয়ে আসা চুল অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আঁচড়ানো। ওঁকে দেখলে মনে হয় যেন ব্যস্ত ধরনের কোনো প্রবীণ কেরানি।

মুখোমুখি, নরম গদি আঁটা দুটো কুর্সিতে ওরা আয়েস করে বসে আছেন এমন একটা ঘরে, যেটা হঠাৎ দেখলে মনে হবে ফেদারবির সদর দফতর না হয়ে যেন সাক্ষাৎকারের কোনো নিভৃত কক্ষ। সাধারণত সরকারী দফতরগুলো যেমন হয়, এ ঘরখানাও ওই একই রীতিতে গালচে চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজানো, দেওয়ালে টাঙানো ওয়াশিংটন, জেফারসন আর লিঙ্কনের ছবি। ফেদারবি নিজেও মোটাসোটা আর হাসিখুশি ধরনের মানুষ, যিনি নিঃসন্দেহে নিজের কাজ নিয়ে খুশি। বেঁটের ওপর বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা, কিনারবিহীন চশমার ওপারে স্বচ্ছ নীল দুটো চোখ, বাদামী চুলগুলো পরিপাটিভাবে আঁচড়ানো, গোল চিবুক, ছোট ছোট দুটো ভাঁজে থুতনিটা নেমে এসেছে নিচে। নিউইয়র্কের

হাল-ফ্যাসানের রীতি অগ্রাহ্য করেই পরেছেন একটা ঢিলে বহির্বাস, যার বোতামের সারি নেমে এসেছে কোমরের কাছ পর্যন্ত। বহির্বাসের ওপর একটা সোনার শিকলি, তাতে বুঝছে 'ফি বেটা কাপা' (অর্থাৎ দর্শনই জীবনের পদপ্রদর্শক) লেখা একটা তাবিজ। ছাইরঙা মিহি পশমী সুতোর প্যান্ট, সাদা শার্ট, গাঢ় বাদামী রঙের ঝকঝকে পালিশ করা বুট, জামার হাতায় সোনার কব্জি-বোতাম। তাঁর কোলের ওপর পড়ে রয়েছে ম্যানিলা কাগজের ভাঁজ করা একটা ফাইল। সব মিলিয়ে তাঁর ব্যবহার রীতিমতো উষ্ণ আর নম্র। দুজনের মধ্যে তিনিই প্রথম আলোচনার সূত্রপাত করলেন :

'আপনি বরং এটাকে আমাদের দুজনের মধ্যে বিধিবহির্ভূত নিতান্ত একটা ঘরোয়া আলোচনা হিসেবেই ধরে নেওয়ার চেষ্টা করুন, মিস্টার নিউটন। আপনি যে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চান, এর জন্যে আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ। কেউ আপনাকে এখানে আসতে বলেনি, কেউ আপনাকে এখানে আসার জন্যে জোরও করেনি। এসব ব্যাপারে আমরা সত্যিই খুব সতর্ক। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনার সহযোগিতাকে স্বাগত জানাতে আমাদের কোথাও কোনো কুণ্ঠা আছে। তাই আমি চাই, আপনি আমাকে—সামগ্রিকভাবে এই দফতরটাকেই, আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করুন।'

এমনিভাবে ওঁরা দুজনে শুরু করলেন এবং ফেদারবির আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহের কোথাও কোনো অবকাশ ছিলো না। তাঁর আবেদনে ছিলো নিপুণ দক্ষতা, কোনো ব্যাপারেই তিনি জোর বা চাপাচাপি করেননি। লুথার নিউটনকে তিনি ভাববার অবকাশ দিয়েছিলেন যে ওঁর স্বপ্নকল্লের অন্তত খানিকটা অংশ সত্যি এবং ওরা ওঁর কাছ থেকে খবরাখবর নিতে আগ্রহী। এমন কি এখনও, ওঁর যাকিছু বলার ছিলো তা প্রায় শেষ হয়ে আসার পরেও, উনি যে গুপ্তচরের ভূমিকায় ধ্রুপদী অভিনেতা হিসেবে অভিনয় করতে পারেননি—এ বিষয়ে তখনও নিজের সঙ্গে তর্ক করার অনুমতি ওঁকে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এটাকে উনি

মেনে নেবেন, না নেবেন না—এই রকম যখন ওঁর মানসিক অবস্থা, ফেদারবি তখন জিগেস করলেন :

'ঠিক বিশেষ কি কারণে আপনি আমাদের কাছে এসেছেন, মিস্টার নিউটন ?'

নিজের সম্পর্কে লুথার নিউটন অবচেতন নন। উনি বলতে পারতেন [ক] আমি ভয় পেয়েছি [খ] যা বিশ্বাস করি না, এখন আর তার জন্যে কোনো মূল্য দিতে আমি রাজি নই [গ] এর মধ্যে কোথায় কাদের যেন একটা গোপন চক্রান্ত রয়েছে [ঘ] আমি চাই লোকে আমাকে আপনারই মতো একজন বলিষ্ঠ, মর্যাদাসম্পন্ন, প্রতিবাদ করতে জানা মানুষ হিসেবে গণ্য করুক।

কিন্তু এসব উনি কিছু বললেন না, বললেন এ ক্ষেত্রে যেটা বলা উচিত এবং নিজের জন্যেও যেটা বিশেষ প্রয়োজন। উনি জানেন মিস্টার ফেদারবি কি চান, আর তিনি যা চান তার ভিত্তিতেই লুথার নিউটন জবাবটাকে মনে মনে সাজিয়ে নিলেন।

'আমি কেন আপনার কাছে এসেছি, এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুব একটা সহজ নয়, মিস্টার ফেদারবি। আগে এমন একটা সময় ছিলো যখন ভাবতাম—যৌবনে যাতে বিশ্বাস করতাম এমন কোনো সংগঠনের মাধ্যমে দেশের সেবা করবো। কিন্তু আজ আর আমি যুবক নই, অনেক ব্যাপারে আমার চোখও খুলে গ্যাছে। আজ নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সবকিছুকে তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখার চেষ্টা করি। এখন বুঝতে পারি একই সঙ্গে দুটো শক্তিকে ব্যবহার করা যায় না। ঠিক যেমন যায় না একই সঙ্গে দুটো ঈশ্বরের প্রার্থনা করা।'

ফেদারবি নিঃশব্দে শুধু ঘাড় নাড়লেন, এ ব্যাপারে আর জেদাজেদি করলেন না। কেননা মিস্টার নিউটনের মধ্যে যে সৃজনশীল একটা উদ্দীপনা ক্রমশই সঞ্চারিত হচ্ছে, সেটা তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু তা নির্দিষ্ট একটা রূপ না নেওয়া পর্যন্ত এর পেছনে লেগে থাকতে তিনি দ্বিধা বোধ করলেন।

'আচ্ছা, 'দি গেজেট' পত্রিকায় আপনার ভূমিকাটা কি?' অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তিনি প্রশ্ন করলেন। 'আমি যতটুকু জানি, আক্ষরিক অর্থে আপনি ওই পত্রিকার সম্পাদক। কিন্তু তাতে বিশেষ কি কিছু এসে যায়?'

'পত্রিকার রাজনৈতিক বক্তব্যের জন্যে, বিশেষ করে সম্পাদকীয়ের জন্যে সম্পাদকই দায়ী। অধিকাংশ সম্পাদকীয় তিনি নিজেই লেখেন এবং এমন ভাবে লেখেন যাতে পত্রিকার নির্দিষ্ট একটা চরিত্র ফুটে ওঠে। খবর এবং অন্যান্য নিবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কেও তিনি ওই একই দৃষ্টিকোণে থেকে নির্দেশ দিতে পারেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি নিশ্চয় জানেন যে কোনো খবরের কাগজই তাদের সংবাদদাতা আর তার-বার্তার মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমান খবর সংগ্রহ করে না। সংবাদ সরবরাহের ওপর তাঁরা নির্দেশ দেন, তাকে ব্যবহার করেন। এবং সেটাই সম্পাদকের সত্যিকারের কাজ...কিন্তু এখন আমি আর ওসব কিছু করছি না। বেশ কিছুদিন ধবেই করছি না।'

'কেন করছেন না, মিস্টার নিউটন?'

'মনের দিক থেকে ঠিক সায় পাই না, ইচ্ছে বা বিশ্বাসের অভাবও বলতে পারেন। বিশ্বাস যখন থেমে যায়, সত্যিকারের চাওয়াটাও তখন থেমে যেতে বাধ্য। যখন সন্দেহ দেখা দেয়, আর সেই সন্দেহকেও যখন ছাপিয়ে ওঠে প্রমান—তখন আপনার কাজের স্পৃহা কমে যেতে বাধ্য।' দুঃখ ও আত্মবিশ্লেষনের গভীর আর্তিকে প্রকাশ করার ভঙ্গিতে উনি ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন, আর ফেদারবি 'প্রমাণ' শব্দটাকে এমনভাবে মনের মধ্যে গেঁথে রাখলেন যাতে ভবিষ্যতে নজির হিসেবে ওটাকে ব্যবহার করতে পারেন।

'আচ্ছা, কতদিন ধরে আপনি সম্পাদকের ভূমিকা পালন করা থেকে বিরত রয়েছেন?'

'আজ থেকে বেশ কয়েক মাস ধরেই, অন্তত আমার ধারণা কাজটাকে যেভাবে সম্পূর্ণ করা উচিত, আমি সেভাবে করতে পারছি না।'

কেদারবি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেন লুথার নিউটনের ছুঁচলো থুতনি, গোল মুখ, ফোলা ফোলা পল্লবে প্রায় ঢেকে যাওয়া ছোট ছোট ছুটো চোখ। তাঁর মনে হলো লোকটা নিঃসন্দেহে একটা নমুনা, একটা পদক্ষেপ, ইতিহাসের একটা আলোচ্য বিষয়, সময়ের একটা ধাপ, এক ধরনের খবর, মানবিক একটা সত্তা, হয়তো কোনো সংজ্ঞা, একটা নিটোল রহস্য। কিন্তু এইসব সিদ্ধান্তকে নিজের মনের মধ্যে সংগোপনে রেখে কেদারবি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন করলেন:

'আপনি কি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য?'

লুথার নিউটন খানিকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন, তারপর মাথা নেড়ে ছোট্ট করে বললেন, 'হ্যাঁ।'

কিন্তু ওই 'খানিকক্ষণ'-এর মধ্যেই লুথার নিউটনের সুনির্দিষ্ট পৃথিবীটা ছুলে উঠলো, যেন নিজেকে সামলে নিয়ে উনি আবার বললেন, 'হ্যাঁ, আমি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য।'

মগ্ন হয়ে ভাবতে ভবতে নিউটন এমন ভাবে স্বীকার করলেন যেন ওঁর মধ্যে বিরাট একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। যেন অজস্র কল্পনার মধ্যে থেকে একটা বিশেষ স্মৃতি ওঁর মনকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মানসচক্ষে উনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন পারির প্রশস্ত একটা রাজপথ—ওঁর ধারণা উনি সেখানে রয়েছেন, অবশ্য অন্য কোথাও হতে পারতো—শ্রমিকরা সেখানে গড়ে তুলেছে একটা অবরোধ, খুঁড়ে তুলেছে রাস্তার পাথর, তার ওপর জড়ো করেছে যত রাজ্যের ঠেলাগাড়ি, আসবাবপত্র, ভাঙা কাঠের টুকরো আর বালির বস্তা। তার আড়ালে পাশাপাশি আত্মগোপন করে রয়েছে নারী আর পুরুষ, এমন কি বাচ্চারাও রয়েছে। পুরুষরা টুপিগুলো ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে মাথার পেছনে, রাইফেল বাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে ওরা অপেক্ষা করছে। তখনকার মনের সেই ছবিতে, দীপ্ত ঝলকে যে স্মৃতিটা সবচাইতে বেশি আলোকিত হয়ে উঠলো—অসম্ভব দীর্ঘ, বিষণ্ণ মুখ একটা মানুষ সবার মাথা ছাড়িয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে

রয়েছে। হঠাৎ মুখ থেকে বাদামী রঙের সিগারেটটা নামিয়ে নিয়ে সে গান গাইতে শুরু করলো—শব্দবিহীন কথা, কথাবিহীন শব্দগুলো আছড়ে পড়তে লাগলো লুথারের মস্তিষ্কের গহন কন্দরে।

বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষের মন যে কি অসম্ভব দ্রুত কাজ করতে পারে, সত্যিই কল্পনা করা যায় না। আগের প্রশ্নে লুথারের জবাব এবং পরবর্তী প্রশ্ন করার মাঝখানে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এই সমস্ত দৃশ্য ওঁর মানসচক্ষে স্পষ্ট ভেসে উঠেছিলো। এমন কি অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটি কোনো বর্ণনাও বাদ যায়নি—অবরোধের সামনে ঘোড়ার নাদিতে ঠোঁট দিয়ে পোকা খুঁটে চলা একটা পাখি, তির্যক ভাবে ঢালু হয়ে নামা ছাদের ওপর ভারি সুন্দর দেখতে চিমনিগুলো, চারতলা একটা বাড়ির জানলার সামনের দড়িতে শুকতে দেওয়া জামাকাপড়ের সারি, একটা ছোট ছেলে যার ইচ্ছে অবরোধের একেবারে চূড়ায় উঠে দড়ির খেলা দেখায়। অনেক বোঝানো সত্ত্বেও যখন কোনো ফল হলো না, ক্রুদ্ধ পিতা ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিলো ওর গালে, এমন কি অবরোধের একটা জায়গায় একগাদা জিনিসের মধ্যে যে একটা পুরনো সসপ্যান ছিলো, সেটাও এই মুহূর্তে ওঁর স্পষ্ট মনে পড়লো।

কিন্তু সবচেয়ে যেটা স্পষ্ট মনে আছে, তাহলো বিষণ্ন মুখ সেই লম্বা লোকটা, যে ব্যারিকেডের সবচেয়ে উঁচু জায়গাতে একেবারে শেকড়ে গেড়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে চুপচাপ বসেছিলো। তার আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত একটা বাদামী সিগারেট, কথাবিহীন শব্দ আর শব্দবিহীন কথায় তার ঠোঁটদুটো মৃদু নড়ছে। সংক্ষিপ্ততম সেই মুহূর্তে এই দৃশ্যটা যখন লুথারের মনের মধ্যে ভেসে উঠলো, তখন ওঁর মনে হলো ওই গানটার বিষয়বস্তু, শব্দের অর্থগুলো জানা বিশেষ প্রয়োজন—কিন্তু শব্দগুলোর যখন কোনো কথাই নেই, তখন উনি শব্দের অর্থ জানবেন কেমন করে? ঠিক যেমন দ্রুত দৃশ্যটা ওঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো, ঠিক তেমনিই দ্রুত উনি সেই লম্বা লোকটার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং তার চাইতেও দ্রুত লুথারের মনে হলো উনি

লোকটাকে খুব ভালো করেই চেনেন। লোকটা একজন শ্রমিক, যাকে উনি আদৌ পছন্দ করেন না, বরং ভয়ই করেন। লোকটার পরণে সুতো বেরিয়ে পড়া শতছিন্ন পোশাক, অনেক দিনের পুরনো ময়লা নীল কামিজ, অবজ্ঞায় ভরা দীর্ঘ চিবুক, ফাঁক ফাঁক হলদেটে দাঁত। উদ্ধত্য আর ঘৃণায় মেশা মুখ।

ফেদারবির কণ্ঠস্বরই লুথার নিউটনকে বাস্তব পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনলো।

'আপনার পার্টির কার্ড আছে?' ফেদারবি জানতে চাইলেন।

'আমার কি আছে বললেন?' স্বপ্ন ভেঙে নিউটন প্রশ্ন করলেন।

'মানে, আপনি যে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য, সেই সভ্যপদের কার্ড আছে?'

'ঠিক বলতে পারবো না। তবে মনে হয় একসময় ছিলো।'

'আচ্ছা মিস্টার নিউটন, 'দি গেজেট,' পত্রিকার অন্যান্য যে সব কর্মচারী, তারাও কি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য?'

লুথার নিউটন মনে মনে সচকিত হয়ে উঠলেন। স্বাভাবিক এবং যুক্তিসংগতভাবেই উনি বলতে পারতেন, 'আমি জানি না—'কিন্তু তাতে কি ওরা অত সহজে ওঁকে মুক্তি দেবে?

'ওদের কেউ কেউ পার্টির সভ্য।' শান্ত স্থির ভাবেই উনি জবাব দিলেন।

'কেউ কেউ কেন? 'দি গেজেট' তো পার্টিরই পত্রিকা?'

'হ্যাঁ, একদিক থেকে সত্যি, আবার একদিক থেকে সত্যি নয়ও বটে। এই পত্রিকার মালিক কমিউনিস্ট পার্টি নয়, এর মালিক পত্রিকার কর্মচারীরা। তবে একথা সত্যি, কর্মচারীদের কেউ কেউ পার্টির সভ্য এবং সাধারণত পার্টির ভাবনাকেই প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আপনি তো বুঝতেই পারছেন, সে শুধু গোলামের মতো আজ্ঞাবাহী হয়ে...' যেন সম্মানের শেষ সূত্রটুকুকে আঁকড়ে ধরে উনি অনুনয়ের

ভঙ্গিতে ফেদারবির মুখের দিকে তাকালেন। '...আমাদের প্রায়ই ওই ধরনের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে হয়।'

'আর পার্টির নির্দেশ?' 'দি গেজেট' কি পার্টির নির্দেশ মেনে চলে?'

'এ প্রশ্নের জবাব এক কথা 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে বোঝানো খুব কঠিন। প্রায়ই পার্টির সিদ্ধান্ত আর সংকল্প যখন সংবাদ হিসেবে প্রচারের জন্যে এসে পৌঁছোয়, তখন 'দি গেজেট'-এ তা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে হয়, এমন কি অন্য কোনো পত্রিকায় যদি তা প্রকাশিত না হয়, তবুও। সম্প্রতি শোধনবাদ এবং আমেরিকান কমিউনিস্টদের নেওয়া অস্বাভাবিক মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে পার্টিকে এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। কিন্তু মুশকিল কি হয়েছে জানেন, দেশ হিসেবে আমেরিকা এমনই ব্যতিক্রম, বিশেষ করে তার ধ্রুপদী অর্থনৈতিক ভূমিকা—যা অন্য কোথাও প্রযোজ্য হলেও, এখানে ঠিক খাটে না। আমাদের পত্রিকা এই বিতর্কে যোগ দিয়ে ব্যতিক্রমবাদীদের মনোভাবের বিরুদ্ধে একটা জায়গা করে নিয়েছে। সেইদিক থেকে বলতে পারেন 'দি গেজেট' পার্টির কাজ করে চলেছে।'

ফেদারবির মনে হলো এবার তিনি যেন লুথার নিউটনকে একটু একটু করে বুঝতে পারছেন, তাই অত্যন্ত নম্রভাবেই বললেন, 'আপনি বলেছেন পত্রিকার কর্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ পার্টির সভ্য নয়। যদি কিছু মনে না করেন, আপনি কি তাদের নামগুলো বলতে পারেন?'

'একজন গুপ্তচরের ভূমিকা পালন করার জন্যে আমি এখানে আসিনি, মিস্টার ফেদারবি। আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাই, বিশেষ কয়েকটা বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে চাই—হ্যাঁ, এই সঙ্কটের মুহূর্তে আমি নিশ্চয়ই দেশের কাজ করতে চাই। কিন্তু গুপ্তচরবৃত্তিটাকে আমি সত্যিই ঘৃণা করি।'

'আপনি কিন্তু ভুল করছেন,' ফেদারবি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। 'আমি যে প্রশ্ন করেছিলাম, তার জবাব

দেওয়াটা গুপ্তচরবৃত্তি নয়, বরং রক্ষা করা—কয়েকজন মানুষ, যারা অসতর্ক মুহূর্তে একটা বিশ্রী পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিলো, তাদেরকে রক্ষা করা।'

'আপনি বুঝতেই পারছেন, মিস্টার ফেদারবি ; কর্মীদের মধ্যে কারা কারা কমিউনিস্ট সুনির্দিষ্ট ভাবে আমার জানার কোনো সুযোগ নেই। আমি হয়তো অনুমান করতে পারি, কিন্তু আমাদের একসঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না, বা আমি সরাসরি ওদের জিগেসও করতে পারি না। এখন আপনি যদি মিসেস কাল্ডওয়েলের কথাই ধরেন—আমার মনে হয় না ও কমিউনিস্ট।' এটাই প্রথম নাম যেটা লুথার নিউটনের মাথায় এলো, এবং সেটাই উনি ফেদারবির দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

ফেদারবি নড়ে চড়ে বসলেন। 'এলিজাবেথ কাল্ডওয়েল ?'

'হ্যাঁ।'

আসন ছেড়ে ফেদারবি তাঁর ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেলেন। কাগজে কি যেন লিখে ঘন্টি বাজালেন। দরজাটা খুলে গেলো, ভেতরে প্রবেশ করলো একজন তরুণ। ফেদারবি তার দিকে কাগজের টুকরোটা এগিয়ে দিলেন। তারপর সেই ম্যানিলা কাগজের ভাঁজকরা ফাইলটা, যেটা তাঁর কোলের ওপরে ছিলো, তার মধ্যে থেকে কয়েকটা কাগজ আলাদা করে বেছে রাখলেন। এমন সময় দরজ ঠেলে সেই তরুণটি একটা ফাইল দিয়ে গেলো, যেটা অনেকটা আগেরটারই মতো দেখতে। ফেদারবি আবার নিউটনের মুখোমুখি আসনটায় ফিরে এলেন। নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে, অনেকটা ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতেই, কোলের ওপর রাখা কাগজপত্র থেকে তিনি ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করলেন :

'কাল্ডওয়েল এলিজাবেথ—বয়েস উনত্রিশ, জন্ম ডারহাম, উত্তর ক্যারোলিনা, আগের নাম ইলিজাবেথ ম্যাডিসন—উচ্চতা পাঁচ ফুট ছ ইঞ্চি, চোখ নীল, চুল কালো। ১৯৩৫ সালের এপ্রিলে, উত্তর ক্যারোলিনার চ্যাপেল হিলে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৩৯ সালে অ্যালবার্ট

ক্যাল্ডওয়েলকে বিয়ে করেন। ১৯৪০ সালে নিউইয়র্ক শহরে সংবাদপত্র বিভাগে যোগ দেন। প্রতি সপ্তায় ব্রুক্‌লিন হাইটস্‌-এর ১৬ নম্বর ডেরি প্লেসে পার্টির মিটিং-এ অংশ নেন। সংবাদপত্রের ইউনিয়নে সক্রিয় কর্মী হিসেবে ওর নাম পাঠানো হয়। নিউ ইয়র্ক শহরে নাম করা কোনো সংবাদপত্রে কাজের জন্যে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক-মণ্ডলী থেকেও চাপ দেওয়া হয়। ১৯৪১ সালের জুলাই-এ 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা' এবং 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা'র ওপর দুটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন...'

ফেদারবির কণ্ঠস্বর কাঁপতে কাঁপতে থেমে গেলো, এবং কেমন যেন একটা ভর্ৎসনার ছায়া নিয়েই তিনি লুথার নিউটনের দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

'এবার বলুন মিস্টার নিউটন, আপনি কি মনে করেন—কবে আপনারা নিজে থেকে আসবেন তার প্রতীক্ষায় আমাদের দফতর বছরের পর বছর চুপচাপ বসে রয়েছে? তা বলে আপনার আন্তরিকতাকে আমি এতটুকুও ছোট করতে চাই না, আমাদের কাছে এর মূল্য অপরিসীম—এবং দেশের প্রতি আপনার এই যে কর্তব্য বোধ, তাকে কোথাও এতটুকু অমর্যাদা করা হবে না। কিন্তু আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে আমরা কিছু করি না?'

'আপনি কি মনে করেন যে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যে বলছি?'

'আমি জানি না, মিস্টার নিউটন, সত্যিই আমি জানি না। হঠাৎ লাফিয়ে কোনো সিদ্ধান্তকে ছিনিয়ে নেওয়া স্বভাব আমার নয়। আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে আমি আরও স্পষ্ট ভাবে বুঝতে চাই। আমাদের প্রথম দিককার আলোচনায় আপনি 'সন্দেহ' এবং 'প্রমাণ' শব্দদুটোকে ব্যবহার করেছেন। অন্যভাবে বলতে গেলে—আপনি আভাস দিয়েছেন যে প্রথমে আপনি সন্দেহ করতে শুরু করেন, পরে প্রমাণই আপনার সেই সন্দেহকে আরও সুদৃঢ় করে। প্রমাণ বলতে আমার ধারণা আপনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে এখানকার

কমিউনিস্ট পার্টি, যাকে আমরা সাধারণত প্রকৃত রাজনৈতিক দল হিসেবে মনে করি, এটা তা নয়, বরং এটাকে একটা ষড়যন্ত্রকারী দল হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়—যারা বিদেশী শক্তির উস্কানিতে জোর কোরে উৎশৃঙ্খল ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের এই সরকারের পতন ঘটাতে চায়। কি বলতে চাইছি আশা করি আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন?'

সহজভাবে ওঁকে বুঝতে পারার চাইতে লুথার নিউটন তখন বরফের মতো জমাট বেঁধে গেছেন। সেই মুহূর্তে উনি হয়তে ফেদারবির চাইতে আরও দু-এক পা এগিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু ওঁর অক্ষমতাই স্মরণ করিয়ে দিলো—এখন আর ফেরার কোনো পথ নেই, এমন কি যে পদচিহ্ন ওঁকে এখানে নিয়ে এসেছিলো, তারও আর কোথাও কোনো অস্তিত্ব নেই।

এ প্রসঙ্গে কেউ হয়তো বলতে পারেন যে ওই সব পদচিহ্ন আদৌ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, সামনের গন্তব্যস্থলের লক্ষ্যই সবার আগে। কিন্তু এ দুটোর কোনোটাই পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। একটু আগেও যেখানে ছিলেন, তার নাম, তার অবস্থান, এমন কি বর্তমান লক্ষ্যস্থল—এ সবকিছুর হিমেল একটা অস্তিত্ব বিবশ করে দিলো লুথার নিউটনের প্রতিটি শিরা উপশিরা, উনি কিছুতেই স্মরণ করতে পারলেন না কেমন করে এখানে এসে পৌঁছলেন। এখন উনি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতরের গোলগাল, হাসিখুশি আত্মপরিতৃপ্ত একজন প্রতিনিধির মুখোমুখি বসে রয়েছেন—যাঁর এখানে কিছুই করার নেই, এক পাও নড়ার উপায় নেই, চুপিচুপি বাইরে বেরিয়ে যাবার মতো কোনো দরজা নেই, লুকোবার মতো ঝোপঝাড় নেই—কেবল ক্ষীণ সুচতুর একটা হাসির দিকে তাকিয়ে থাকা, যে হাসিটা বলতে চাইছে:

'আপনি কিন্তু স্বেচ্ছায় এখানে এসেছেন, মিস্টার নিউটন।'

'হ্যাঁ, তা আমি জানি। কিন্তু কেন এসেছি তা তো আর জানেন না—এসেছি, যেহেতু পৃথিবীর পাছাটা ভারি হয়ে চেপে বসেছে আমার কাঁধে। কিন্তু চুলোয় যাগ্‌গে ওসব। আমি স্বেচ্ছায় এসেছি,

এটাই বড় কথা।' মনে মনে এসব ভাবলেও, লুথার নিউটন মুখে যা বললেন তা সম্পূর্ণ অন্য রকম।

উনি বললেন, 'হ্যাঁ, মিস্টার ফেদারবি, আপনি যা বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পেরেছি।'

'সত্যি ?'

'হ্যাঁ।' নিউটন ছোট্ট করে ঘাড় নাড়লেন।

'আপনি পরিণত মানুষ, আশা করি আমাদের এই সাক্ষাৎকারের গুরুত্বটাও আপনি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন, মিস্টার নিউটন।'

'মনে হয় পারবো।'

'আমাদের সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্যে যদি আমার সাংকেতিকলিপিককে ডাকি, আপনার কি কোনো আপত্তি আছে ?'

'আমি পরিণত মানুষ, মিস্টার ফেদারবি। এর বিনিময়ে আমি কোন্ ধরনের প্রতিশ্রুতি আশা করতে পারি ?'

'ও!'

'না, এটা আমার সত্যিই জানা দরকার।'

'যে জায়গায় রয়েছি, নিরাপত্তা ছাড়া আপনাকে আর অন্য কোনো প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারি না, মিস্টার নিউটন।'

'ওটা কিন্তু যথেষ্ট নয়, মিস্টার ফেদারবি।'

লুথার নিউটন কুর্সির নরম গদিতে গা এলিয়ে দিলেন, স্বস্তির শব্দহীন গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এলো বুকের অতল থেকে। স্বস্তি এই কারণে, যাকিছু করার ছিলো করা হয়ে গেছে, এবং কোনো কিছু তখনই ভালো যখন হাতের তাসগুলো টেবিলে পাতা হয়ে যায় আর প্রতিটা তাসই স্পষ্ট দেখা যায়।

'সত্যিই ওটা যথেষ্ট নয়, মিস্টার ফেদারবি,' উনি আগের শব্দগুলোই পুনরাবৃত্তি করলেন।

উঁ?

কুর্সির হাতলে আঙুলের ডগা দিয়ে লুথার নিউটন তাল ঠুকতে লাগলেন। 'না, সত্যিই ওটা যথেষ্ট নয়। আমরা পরস্পরের দিকে ছুরি উঁচিয়ে প্রস্তুত হয়ে রয়েছি। আপনি হঠাৎ আমাকে বললেন —ব্যাস, এবার আত্মরক্ষার কৌশল ছেড়ে দিন। আমি রাজি হলাম। আত্মরক্ষার কৌশল ছেড়ে দিলাম।'

'আপনি কি সত্যিই আত্মরক্ষার কৌশল ছেড়ে দিয়েছেন, মিস্টার নিউটন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে কিন্তু জবাব দেওয়াটা খুব সহজ।'

'আমি জানি।'

'বেশ, তাহলে আমাদেরই সেই প্রতিশ্রুতিতেই ফিরে যাওয়া যাক। এবার বলুন, আপনি ঠিক কি ধরনের প্রতিশ্রুতি আশা করেন?'

'আমার ধারণা, কমিউনিস্টরা যে প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ এ কথা বলাটা ঠিক নয়।'

'ও, নিশ্চয়ই না…অন্তত এখন তো আর নয়ই।' ফেদরেবি ঠোঁট চেপে হাসলেন। 'এখন আমাদের দুজনের মধ্যে পার্থক্যটা যা কেবল নীতিগত। আপনি যদি চান, বলতে পারেন যে এটা পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে। ইচ্ছে করলে আপনি সাংবাদিক সম্মিলনেও বলতে পারেন। কংগ্রেসী কারুর কাছে কিংবা তাদের সভাতেও বলতে পারেন। এ ব্যাপারে আমি সুনিশ্চিত যে ওরা শিগগিরই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইবে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় সেটা একটা ভালো যুক্তিই হবে। এদিককার সমস্ত ব্যবস্থা আমরা পাকা করে রাখবো। শুরুতে কমিটির সঙ্গে ন্যূনতম সহযোগিতা কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যাপারটাকে অনেক সহজ করে দেবে। কিন্তু আপনি যে প্রসঙ্গটা তুলেছেন, তাতেই ফিরে যাওয়া যাক। কমিউনিস্টরা আপনার যা করবে, বা করতে পারে—আপনি কি সত্যিই তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশ্রুতি চান?

কিন্তু আমি জানি, আপনিও ভালো করে জানেন যে ওরা আপনার কিছু করবে না। বড় জোর 'দি গেজেট' কিংবা 'ডেলি ওয়ার্কার' পত্রিকায় ওরা আপনার নামে কুৎসা রটাতে পারে—কিন্তু তা বলে ওরা আপনাকে গুলি করবে না, ডাকে বোমা পাঠাবে না, বা ওই ধরনের কিছুই করবে না। আর 'দি গেজেট'-এ ওরা যা-ই বলুক না কেন, ওই পত্রিকাটা কে পড়ে বলুন তো? আপনি নিজেই বলুন না—ওটা কি তেমন শক্তিশালী বা অজস্র বিক্রি হয় এমন কোনো পত্রিকা? সুতরাং কমিউনিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি চাওয়ার আপনার কোনো প্রয়োজন নেই, মিস্টার নিউটন। তাহলে বলুন আপনি ঠিক কোন্ ধরনের প্রতিশ্রুতি চান? কেননা আমরা পরস্পর আত্মরক্ষার কৌশল ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছি।'

'বেশ, তাহলে শুরু করা যাক…'

'আমার মনে হয় সাঙ্কেতিকলিপিককে ভেতরে আসতে বলার আগে যদি সবকিছু খুলে বলা যায়, তাহলে হয়তো সেটা ভালোই হবে।'

প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে ফেদারবি ছোট্ট করে হাসলেন।

'১৯৩৮ সালে ওহিওতে আমি বেনামীতে একটা হোটেল নথীভুক্ত করেছিলাম। আমার ধারণা ওটা নিঃসন্দেহে বে-আইনী।'

'ও, আচ্ছা। আপনি কি একাই ছিলেন?'

'না, সঙ্গে একজন মহিলা ছিলো।'

'একবারই?'

'না, চারবার।'

'চারবার?' ফেদারবি ভ্রূ কুঁচকে তাকালেও, এ পৃথিবীর বাস্তববাদী একজন মানুষের মতোই সাবলীল গলায় তিনি বললেন, 'এটা কিন্তু অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না, মিস্টার নিউটন। এটা এক ধরনের বিচ্যুতি, যা পুরুষ-মানুষ মাত্রই ঘটতে পারে। আপনি বরং হোটেলটার নাম আর তারিখ দিন, এ ব্যাপারে যতটুকু সতর্কতা নেওয়া দরকার আমরা নিশ্চয়ই নেবো। আমার বিশ্বাস, এই প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিতে পারি

—এর জন্যে যে ধরনের অসুবিধে হবে, সে ব্যাপারে আমরা আপনাকে সাহায্য করবো।'

'১৯২৯ সালে সান ফ্রান্সিসকোতে টাকা ছিনতাইয়ের ব্যাপারে আমি অপরাধী ছিলাম না। ওরা আমাকে মিথ্যে অভিযুক্ত করে।'

'আপনার কি জেল হয়েছিলো?'

'না, তিনশো ডলার জামিনে ছাড়া পেয়েছিলাম। কিন্তু জামিনে থাকার সময়েই পালিয়ে আসি।'

'সত্যি, একটা জিনিস ভাবতে আমার খুব অবাক লাগছে,' ফেদারবি যেন খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠলেন। 'শান্ত ধরনের মানুষদের অতীতও কত না বৈচিত্রে ভরা থাকতে পারে! অন্তত আমার ধারণা অনুযায়ী আপনি শান্ত ধরনের মানুষ, মিস্টার নিউটন, তাই নয় কি না বলুন?'

'নিজেকে আমি বরাবরই শান্ত ধরনের মানুষ বলেই মনে করি,' লুথার নিউটনের কণ্ঠস্বর কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠলো।

'আপনি কি সত্যই টাকা ছিনতাই করেছিলেন?'

'না।'

'এ নিয়ে অবশ্য এখন আর কিছু এসে যায় না। কেননা সব অপরাধেরই একটা সময়-সীমা থাকে। যদিও আমার ধারণা জামিনে থাকার সময়ে পালিয়ে যাওয়াটা উচিত হয়নি, তবু আমাদের দফতরের সঙ্গে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই। আমার যেটা কাজ তা হলো রেকর্ডে যা নেই তা সংগ্রহ করা। বেশ, এ ছাড়া আর কি আছে বলুন?'

'দু'টো চেক জাল করেছিলাম।'

'তাই নাকি! কত টাকার?'

'একটা সাতশো, আর একটা তিনশো ডলারের।'

'কোন্ বছরে?'

'একত্রিশ-বত্রিশ সালে।

'এ ব্যাপারে কি আপনাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো?'

'না।'

'যদিও এটা নিঃসন্দেহে অপরাধ, তবু তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।'

'আর?'

'আর কিছু নেই, শুধু...'

'বলুন?'

লুথার নিউটন ঢোক গিলে খুব আস্তে আস্তে, প্রায় স্বাভাবিকভাবে, নিজের ওপর অবস্থা রেখে নম্রভাবেই বললেন, 'টাকা।' ওঁর কণ্ঠস্বরে ঔদ্ধত্যের কোথাও কোনো চিহ্ন নেই।

'ঠিক বুঝতে পারলাম না, মিস্টার নিউটন।'

'আপনি তো বুঝতে পারছেন মিস্টার ফেদারবি, আমার পক্ষে 'দি গেজেট'-এ কাজ চালিয়ে যাওয়াটা একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এটা অবশ্য সত্যি, চেষ্টা করলে হয়তো অন্য কোথাও একটা চাকরি জোগাড় করতে পারি। চুপচাপ আমি নিশ্চয়ই বসে থাকবো না। তাছাড়া দাক্ষিণ্যও আমি চাই না। কিন্তু...'

'আপনি আমার কাছ থেকে টাকা চাইছেন, মিস্টার নিউটন?'

'আমার স্ত্রী আছে, বাচ্চা আছে। আমি প্রত্যেকের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াতে পারি, যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারি। কিন্তু ওদের দারিদ্রের মুখে ঠেলে দিতে পারি না।'

'আপনি আমার কাছ থেকে টাকা চাইছে মিস্টার নিউটন, কিন্তু আপনি তো কিছুই করেননি যার জন্যে পারিশ্রমিকে আশা করতে পারেন। সত্যি বলতে কি, এ দফতরের উপোযোগী এখনও পর্যন্ত আপনি কিছুই করেননি।'

'আপনিও কিন্তু কোনো ইঙ্গিতে দেননি যে ঠিক কোন্ ধরনের কাজ আমার কাছ থেকে আশা করেন।' লুথার নিউটন ছোট্ট করে হাসলেন। 'আমি ভবিষ্যতের কথাই বলছিলাম।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, মিস্টার নিউটন। সত্যি বলতে কি এতক্ষণ আমরা ঘরোয়াভাবেই কথা বলছিলাম। যার জন্যে আমি

সাঙ্কেতিকলিপিককেও ডাকিনি। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে আমাদের কাজের ধারা সম্পর্কে আপনাকে কোনো ইঙ্গিত দিইনি —তাহলে বলবো, আবার আমরা আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বন করছি। অথচ আমরা অঙ্গীকার করেছি পরস্পরে আত্মরক্ষার কৌশল ছেড়ে দেবো।'

'আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না, মিস্টার ফেদারবি।'

'অবশ্যই বুঝতে পারছেন, মিস্টার নিউটন। কেবল একটা কাজই আপনি আমাদের জন্যে করতে পারেন। কোনো গোপনীয়তা নয় —কমিউনিস্ট পার্টিতে গোপনীয়তা বলে কিছু নেই এবং আমাদের দুজনের মধ্যেও কোনো গোপনীয়তা থাকবে না। প্রতিনিধি? গোয়েন্দাগিরি? বোমা? ষড়যন্ত্র? না, ওসব কিছু নয়। রূপকথাকে সযত্নে এড়িয়ে এখন আমরা বুদ্ধিমান দুটো মানুষের মতো সরাসরিই পরস্পরে কথা বলবো। কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে আমরা কেবল একটাই জিনিস যা জানি না, তা হলো—কারা কারা এই দলের সভ্য। আমাদের শুধু যে জিনিসটা দরকার, তা হলো নাম। নাম, মিস্টার নিউটন; শুধু নাম। এ ব্যাপারে আপনি আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন—ওরা কারা? কোথায় থাকে? সি. আই. ও-তে কারা আছে? কারা কারা পার্টির কার্ড পেয়েছে? আমেরিকান শ্রমিক-সঙ্ঘে কারা কারা আছে? সম্মানীয় এবং শ্রদ্ধেয় মিস্টার গ্রীনের কারা খুব ঘনিষ্ঠ? শুধু নাম, মিস্টার নিউটন—আর কিছু নয়। কেন্দ্রীয় সংগঠনের কারা কারা আছে, হোয়াইট হাউসের সঙ্গে কাদের যোগাযোগ রয়েছে? আপনি এটাকে আলোচনার সূত্রপাত হিসেবে ধরতে পারেন মিস্টার নিউটন, কিন্তু আমাদের যা চাই তা হলো—নাম।'

'আর তা যদি পান?'

'বিশেষ পরামর্শ ও দক্ষতার জন্যে আমাদের বিশেষ তহবিল আছে। এর জন্যে আমরা ন্যায্য পারিশ্রমিকও দিই। যেমন ধরুন দৈনিক চব্বিশ ডলার, অন্যান্য খরচ আলাদা।'

'দৈনিক চ-ব্বি-শ ডলার।' অস্ফুট স্বরে লুথার নিউটন পুনরাবৃত্তি করলেন।

'এটা আপনাদের সরকারেরই একটা প্রয়োজনীয় কাজ, মিস্টার নিউটন। একে আপনি শুধু ডলারের পরিমাপ দিয়ে যাচাই করবেন না। যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির ওপর দুর্ভাগ্য একদিন না একদিন ঘনিয়ে আসবেই। এর জন্যে অন্য আর যারাই দুঃখ, কষ্ট বা আতঙ্কের শিকার হোক না কেন, আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। কি বলছি আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন?'

লুথার নিউটন ছোট্ট করে ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলেন।

'আপনার জন্যে মেলা থাকবে ঈগলের বলিষ্ঠ দুটো ডানা—এ পৃথিবীতে যার চাইতে বড় নিরাপত্তা আর কিছু নেই। আপনি বুঝতে পারছেন তো, মিস্টার নিউটন?'

'কথাটা কি আপনি লিখে দেবেন, মিস্টার ফেদারবি?'

'আপনি ভুল করছেন, মিস্টার নিউটন—আজ আমরা আর কেউই ছেলেমানুষ নই। তাহলে কি এবার আমার সাঙ্কেতিকলিপিককে ভেতরে আসতে বলবো?'

লুথার নিউটন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

মাথার ওপরে জ্বলন্ত সূর্য, নিচের রাস্তাটা ধুলোয় ভরা। অগনন মানুষের বিরামবিহীন পদসঞ্চারে এই ধুলো আরও কোমল, আরও সূক্ষ্ম কণায় পরিণত হয়েছে। রাস্তটা প্রাচীন। এ অঞ্চলের কেউই জানে না এটা কতদিনের পুরনো। এমন কি কোনো পুঁথি বা নথিপত্রেও এ অঞ্চলটার সম্পর্কে কোথাও উল্লেখ নেই, যা থেকে বোঝা যেতে পারে রাস্তাটা কখন তৈরি হয়েছিলো কিংবা কবে থেকে ছিলো না।

যখনই উত্তপ্ত দমকা বাতাস বইছে, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে সুন্দর সাদা ধুলোর মেঘ। পথিক যারা—কেউ হাঁচ্ছে, কেউ কাশছে, আবার অনেকে ভাবছে এই ধুলোই তাদের কাবু করে ছাড়বে।

দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, এমন কি অন্য কোনো জায়গায় থাকলেও, হঠাৎ দেখলে মনে হবে সবাই বুঝি রাস্তার ওপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘুরে পেঁচিয়ে মোচড় খেতে খেতে রাস্তাটা যেভাবে এগিয়ে গেছে, ঠিক যেন বিশাল একটা সাদা অজগর রৌদ্রদগ্ধ পাহাড়ের নিচে চুপটি করে পড়ে রয়েছে। এখান থেকে রাস্তাটার দু-তিন মাইল পর্যন্তও চোখে পড়ে। আশেপাশে একটাও গাছ নেই, কেবল মানুষের ভিড়।

রাস্তাটার এই অংশে রয়েছে রোদে-পোড়া একটা মাটির চালা। ইটের দেওয়ালের ওপর মাটি লেপা, চালার মাথায় খড়ের ছাউনি। চালাটার সামনের একটা বেঞ্চিতে একজন স্থানীয় লোক অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসে মদ আর জল বিক্রি করছে। দশ গ্যালন ধরার মতো বিরাট একটা জালায় সাদা মদ, অনুরূপ অন্য আর একটা জালায় লাল মদ। খড়ের চালার ঠিক মাঝখানে বেশ মোটা একটা কাঠের গুঁড়ির গায়ে ঝোলানো রয়েছে গোটা বারো চামড়ার ভিস্তি। স্যাঁতস্যাঁতে আর ঠাণ্ডায় তাদের গায়ে জমে রয়েছে সুন্দর গুঁড়ি গুঁড়ি জলের

কৌটা। এ অঞ্চলের কোনো মুসাফির যদি ঘণ্টাখানেক আগেও তার নিজের ভিস্তি থেকে জল খেয়ে থাকে, তবু এখানকার এই দৃশ্য তাকে আবার তৃষ্ণার্ত করে তুলবে, মনে হবে তার গলার ভেতরটা বুঝি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

যার ফলে, এ হেন জায়গায়, মদের জালার সামনে তৃষ্ণার্ত মুসাফিরদের ছোটখাটো ভিড় জমে উঠলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। সুতরাং রৌদ্রতপ্ত সারাটা দিন তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠা নতুন মানুষদের আসা এবং তৃষ্ণা মিটিয়ে ফিরে যাওয়ারও আর কোনো বিরাম নেই। এবং নানান ধরনের মানুষ, যাদের বৈচিত্রের কোনো অভাব নেই—পথচারী ছাড়াও, গাধায় টানা গাড়ির চালক, ছোট ছোট মোটবাহী কুলি, রোদে পোড়া বাদামী চামড়ার জলপাই কুড়ুয়েরা, কাঁচ-গলানো শ্রমিক, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি—প্রত্যেকের যাদের নিজের নিজের পেশার ছাপ সুস্পষ্ট। কাঁচ-গলানো শ্রমিকদের চওড়া বুক, মুখের শিরাগুলো ভঙ্গুর; ছুতোরদের থলিতে হাতুড়ি বাটালি রেঁদা তুরপুন, সারাক্ষণ পাথরের ওপর ঝুঁকে কাজ করতে করতে রাজমিস্ত্রিদের পিঠগুলো বেঁকে গেছে, গ্রন্থিল বলিষ্ঠ বাহু। ভেড়ার পাল সঙ্গে নিয়ে ফেরা মেষপালক, বউ আর বাচ্ছাদের সঙ্গে নিয়ে চলা চাষী, জল বওয়া ভারী, তাঁতি, রুটির কারিগর, শুঁড়ি—যারা মদের গুণাগুণ সম্পর্কে সব চাইতে বেশি তর্ক-বিতর্ক জুড়ে দেয়, কামার, বাঁশি আর খঞ্জনী নিয়ে ঘুরে বেড়ানো গায়ক, আর দীর্ঘ শ্মশ্রু, জীর্ণ পোশাক পরা ভ্রাম্যমান প্রচারক—যারা, যে পথটা অতিক্রম করে এসেছে তার কথা যেমন ভাবে না, তেমনি সামনের পথটার সম্পর্কেও কোনো কিছু পরোয়া করে না, অন্তত গরীবরা যতদিন বড়লোকদের পাপ আর অপকর্ম মন দিয়ে শুনছে।

বস্তুত পক্ষে, নানান পেশা আর বয়েসের এইসব লোকেরা—ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর বিবর্ণতায় যারা প্রায় একই রকম, যেন স্মরণাতীত কাল থেকেই ওরা কোনো দিনও পেট পুরে খেতে পায়নি বা পান করেনি। আর এ ব্যাপারে মদ্যবিক্রেতা নিজের লোকজনদের রীতিমতো গালমন্দ

করে—কেননা একজন মদ আনে আর কুড়িজন জল বয়—তবু ওরা সারাক্ষণই মদের জালাটার কাছে ভিড় জমিয়ে রাখে, জোরে জোরে শ্বাস নেয়, জিভ চাটে এবং একই সঙ্গে এমন নোংরা দুর্গন্ধে ভরা মানুষের একটা জট পাকিয়ে রাখে যে ভালো খদ্দের যারা তারা ট্যাঁক থেকে টাকা-পয়সা বার করতে ঠিক ভরসা পায় না।

এখানে ভালো খদ্দেররাও আসে, কেননা রাস্তায় শুধু যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মেহনত করে বা দুপুর রোদের উত্তাপ সহ্য করে, তারাই নয়—চারদিক-ঢাকা ডুলিতে চেপে ধনী বণিকরাও যাতায়াত করে আর দীর্ঘ সাদা আলখাল্লা পরা যাজক, মুখের চারপাশে যাদের বেশ আয়েশ করে ছড়িয়ে থাকে ঝাঁকড়া দাড়ি, গাধায় চড়ে যাবার সময় যাদের বিশাল বপুগুলো ছন্দ বজায় রেখে ওঠে নামে। এছাড়া আছে বিত্তবান জমিদার, স্বচ্ছল অবস্থার আঞ্চলিক রাজকর্মচারী, উৎকট সাজগোজ করা রক্ষিতা, নাচিয়ে মেয়ে, যারা চড়া দামে তাদের রূপ বিক্রি করে, যারা ডুলির নরম রেশমী গদিতে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকে, মাশুল আদায়কারী, ক্রীতদাস বিক্রেতা, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রান্তের নানান ধরনের সব মানুষ।

মদবিক্রির জায়গাটার সামনে প্রায় সারাক্ষণই এরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে—পথ পরিভ্রমণের নানান অস্বস্তিকর অসুবিধে, পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্পত্তির অধিকারী কোনো মানুষ সেই সব মানুষকে বুঝতে পারে, যারা নিজেরাই সম্পত্তির অংশ স্বরূপ এবং সেইসব মানুষের সম্পত্তি থাকার কোনো প্রয়োজনই নেই, যারা হিসেব করতে পারে না, জানে না সেটা কোথায় কিংবা কি পরিমান আয় তা থেকে উপার্জন করা সম্ভব, ইত্যাদি।

চওড়া কাঁধ একজন কামার বললো যে তার কাছে মনে হয়েছে সে যখন যেখানে গেছে একই পরিমাণ রোজগার করেছে, কেননা যখন যেখানে গেছে প্রত্যেকটা সপ্তা সে শেষ করেছে ঠিক এমনিভাবে যাতে তাকে শুধু উপোষ করতে হয়নি, আর বাকি সবটাই চলে গেছে কর দিতে। অথচ যেখানে সে জন্মেছে, যেখানে সে আজ কুড়ি বছর ধরে

বাস করে আসছে, সেখানে সে কেমন করে এর চাইতে বেশি রোজগার করবে ?

ঠিক অমনি ভাবে একজন বণিকও ব্যাখ্যা করে বোঝালো : একজন মানুষ যার কোনো কালে কোনো সম্পত্তি ছিলো না, সে কোনো দিনই বুঝতে পারবে না সম্পত্তিটাকে ঠিক মতো চালনা করাটা কি ভীষণ জটিল আর দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এ প্রসঙ্গে অন্যরা কিছুই বলতে পারলো না, কেননা শ্রোতাদের অধিকাংশই তাদের সম্পত্তি পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু একজন মেষপালক বললো তার ধারণা সে সম্পত্তি চালানোর ব্যাপারটা বোঝে, যেহেতু তার ভেড়ার ছোটখাটো একটা পাল আছে, তাদের খাওয়ানো চরানো নাদি পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে সবকিছু তাকেই করতে হয়, সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে হয় এবং ওদের থেকে উৎপন্ন যা কিছু সবই সরকারের কাছে চলে যায়। ঘটনাটা এমনই বাস্তব যে শ্রোতাদের কেউই হাসলো না বরং একজন যাজকই চোখ পাকিয়ে বললেন যে এ ধরনের কথাবার্তা একজন নাস্তিকের চাইতেও অনেক বেশি ক্ষতিকর।

'পেশাই মানুষের জীবন,' যে চাষীটি মন্তব্য করেছিলো যে দুবেলা দুটুকরো রুটি পাবার অধিকর তার আছে, তাকে উপেক্ষা করেই একজন কর আদায়কারী বললো। 'এই আমার দিকেই তাকায়ে ছাখো না কেন, আজ বারো বছর আমি উত্তর অঞ্চলে কর আদায় করছি। এখন আমাকে কর আদায় করার জন্যে যেতে হচ্ছে দক্ষিণে, যেখানে আমি জন্মেছি, আর দক্ষিণের একজন মানুষ যাচ্ছে উত্তরাঞ্চলে কর আদায় করতে। এটা যে শুধু উচিত তাই নয়, যুক্তিসংগতও বটে। আমি যেখানে জন্মেছি সেখানে সবাই আমাকে চেনে, যেখানে ছিলাম কে আমাকে চিনতো বলো—আর লোকে যদি আমাকে না-ই চেনে তাহলে করের ব্যাপারে ঠিক মতন নজর থাকবেই বা কেমন করে ?'

একজন জলপাই-কুড়ুয়ে বললো, 'আর যাদের কোনো পেশা বা কাজ নেই, তারা করের টাকা গুনবে কোত্থেকে ?'

'হবে, হবে···আমরা যদি ঠিক মতো এগিয়ে যেতে পারি, তখন আর কাজের কোনো অভাবই হবে না। একদিন এ দেশটা মরে গিয়েছিলো, এখন আবার একটু একটু করে বেঁচে উঠছে। আর আমরা যারা সরকারী কাজে রয়েছি, শেষ পর্যন্ত সঠিক হিসেবটা আঙুলের ডগায় খুঁজে বার করতে পেরেছি—কত লোক, কত সম্পদ, কত কর···'

এই আলোচনা যখন চলছে, সারাবখানাটাকে ঘিরে দাঁড়ানো ছোট-খাটো দলটার সঙ্গে আরও দুজন মুসাফির এসে যোগ দিলো—একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। লোকটা এসেছে পায়ে হেঁটে আর মেয়েটা হাড়-জিরজিরে ছোটখাটো একটা গাধায় চড়ে। সব মিলিয়ে ওরা দুজনেই চোখে পড়ার মতো। লোকটা খুব লম্বা, একরাশ কুচকচে কালো দাড়ি এসে পড়েছে বুকের ওপর আর মেয়েটা আশ্চর্য রূপসী, সর্বাঙ্গ ধুলোয় ভরা। মেয়েটি যে শুধু আসন্নপ্রসবা তাই-ই নয়, যে-কোনো মুহূর্তে বাচ্ছা হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। মাথাটা ঝুঁকে রয়েছে বুকের ওপর, দাঁতে-চেপে-রাখা যন্ত্রণায় মুখখানা ম্লান। কেবল স্বামী যখন কিছু বলছে, মেয়েটা তার দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে, যন্ত্রণা-ভেজা মুখখানায় ফুটিয়ে তুলছে এক টুকরো করুণ হাসি, যাতে প্রকাশ পাচ্ছে স্বামীর প্রতি ওর কোমল ভালোবাসা। সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছে ও যেন তামাম দুনিয়াটাকে ডেকে বলছে, 'আমার এই মনের মানুষটার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো—কত লম্বা, কি বলিষ্ঠ আর কেমন দুর্লভ সুন্দর দেখতে!' কিন্তু লোকটাও ক্লান্ত, শুকনো মুখে চোয়ালের হাড়দুটো স্পষ্ট ফুটে উঠেছে, তাকে দেখে মনে হচ্ছে—কোমর থেকে ঝোলানো হাতুড়ি, বাটালি আর তুরপনের ভারি থলিটার ভারে যেন নুয়ে পড়ছে।

লোকটা বার বার উদ্বিগ্ন চোখে তাকাচ্ছে স্ত্রীর দিকে, জিগেস করছে ও এখন কেমন আছে। সামনেই রয়েছে ঝাঁকড়া একটা জলপাইয়ের গাছ, লোকটা ভাবলো যদি গাছটার ছায়ায় বসে একটু বিশ্রাম নিতে পারে তাহলে হয়তো ওর পক্ষে ভালো হবে। ওর কি আবার ব্যথা উঠেছে? ব্যথা আগেও উঠেছিলো, কিন্তু ও বলেছে যে থেমে গেছে।

লোকটি ওকে সান্ত্বনা দিয়েছে রাত ঘনিয়ে ওঠার আগে ওরা যে ভাবেই হোক কোনো না কোনো সরাইখানায় পৌঁছে যাবে। মেয়েটি নিজেই স্বীকার করেছে যে ওর জন্যেই ওদের এত আস্তে আস্তে চলতে হচ্ছে এবং সেই জন্যেই এই পথযাত্রা এত ক্লান্তিকর আর একঘেয়ে হয়ে উঠেছে।

জলপাই গাছের ছায়ায় আরও প্রায় দশ-বারোজন লোক বসেছিলো, কিন্তু মেয়েটির অবস্থা দেখে সবাই ওর জন্যে জায়গা করে দিলো। ওদের কেউ কেউ বাচ্ছাটার জন্মানোর ব্যাপারে শুভ কামনা করলো, কেউ বা বললো সম্রাটের লোভ আর পাগলামি চরিতার্থ করার জন্যে এ রকম একটা অবস্থায় কোনো মহিলাকে এতখানি পথ, প্রায় আর্ধেকটা দেশ, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসাটা সত্যিই লজ্জাকর। এ নিয়ে অল্প-বিস্তর সবাই যখন আলোচনায় ব্যস্ত, দাড়িওয়ালা লোকটা তখন স্ত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তৎপর হয়ে উঠলো। ওকে জিগেস করলো ওর এক গেলাস মদ চলবে কি না—তাতে শরীরটা একটু চাঙ্গা হবে, ব্যথা উঠলে হয়তো তাকে ঠেকিয়ে রাখার কিছুটা শক্তি পাবে।

'মদের তো অনেক দাম!' মেয়েটি আপত্তি জানালো।

'দেখিই না কি বলে,' এই বলে লোকটি মদের জালার সামনে দাঁড়ানো ভিড়টার দিকে এগিয়ে গেলো। ক্লান্ত, মন্থর গায়ে এগিয়ে যেতে যেতেই সে টাকা-পয়সা রাখার ছোট ব্যগটা হাতড়ে হাতড়ে দেখতে লাগলো, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার কড়া-পড়া, চওড়া হাতের তালুতে ছোট ছোট চারটে রুপোর মুদ্রা উঠে এলো। ঝগড়াটে বা রগচটা ধরনের মানুষ সে নয়, ভদ্রভাবে, প্রায় ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতেই, ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে পথ করে নিয়ে অবশেষে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছলো, যেখানে সে এক পেয়ালা মদের দাম কত জিগেস করার সুযোগ পেলো। কিন্তু তাকে যখন দাম বলা হলো, তার মুখখানা শুকিয়ে গেলো, অসহায়ের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো চেটোর ওপর থাকা ছোট ছোট মুদ্রা চারটের দিকে।

'হয় কেনো, নয়তো সরে দাঁড়াও,' শুঁড়িখানার মালিক খেঁকিয়ে উঠলো। 'দেখছো না খদ্দেররা সব দাঁড়িয়ে রয়েছে। দৈত্যের মতো অমন একখানা পেল্লাই চেহারা নিয়ে যদি পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকো তো কে কাছে ঘেঁষবে বলো?'

বিরাট চোহারার লোকটা প্রায় অনুনয়ের ভঙ্গিতেই বোঝাবার চেষ্টা করলো যে সে ছুতোর, হাতের কাজ তার সত্যিই খুব ভালো। এক পেয়ালা মদের বিনিময়ে সে কি কোনো কাজ করে দিতে পারে না? সমস্ত চালাটাই হেলে পড়েছে। চাইলে সে এখনি এটাকে ঠিক করে দিতে পারে এবং এমনভাবে ঠিক করে দেবে যে বছর খানেকের মধ্যে আর কিছু করতে হবে না।

'সারাদিন ধরে অমন ভুরি ভুরি প্রস্তাব আসছে,' সরাইখানার মালিক তাকে ফুটিয়ে দেবার ধান্ধায় বললো। 'এ অঞ্চলটায় ছুতোর আর রাজমিস্ত্রীদের ফয়দা তোলার কোনো সুযোগ নেই। ওরা সবাই তোমার মতোই উঞ্ছবৃত্তি করে। যদি কিছু কেনার থাকে তো কেনো, নয়তো সোজা এখান থেকে কাটো।'

এক পেয়ালা জল কিনে সে স্ত্রীর কাছে নিয়ে এলো। স্ত্রী যখন এর থেকেই একটু জল তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করলো, সে মিথ্যে করেই বললো যেখানে মদ বিক্রি হচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়েই সে এক পেয়ালা জল খেয়েছে। তখন মেয়েটি গাধার পিঠে বয়ে আনা একটা ঝোলা থেকে এক টুকরো শুকনো রুটি বার করে খেলো, একটা ফোঁটাও ফেলে না রেখে সবটুকু জল পান করলো। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো. 'আঃ, জলটা কি মিষ্টি।' তখন লোকটা বললো এর একমাত্র কারণ সে ওকে ভীষণ ভালোবাসে বলেই অত্যন্ত তুচ্ছ ছোটখাটো জিনিসগুলোকেও ও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছে, যা অন্য কেউ হলে হয়তো অভিসম্পাতই দিতো—যদি না এই দেশটা এমন উকুন আর রক্তচোষাতে ভরে উঠতো, যারা তাদের জীবন-রসের শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্তও শুষে নিচ্ছে।

'তার মানে তুমি কি বলতে চাও,' হাসতে হাসতে মেয়েটি বললো, 'অন্তত বাচ্চাটার মুখ চেয়েও আমি একটু হাসি-খুশি থাকতে পারবো না ?'

'বাচ্চাটা খুব মোটাসোটা আর বলিষ্ঠ হবে, তুমি দেখো।'

কিন্তু জলপাই গাছের ছায়া থেকে অন্য একজন মন্তব্য করলো যে আজকাল শ্রমজীবী মানুষদের দিন দিন যা হাল হচ্ছে, তাতে বাচ্চাটা না জন্মালেই ও বোধ হয় সব চাইতে খুশি···

বাকি পথটা আবার পাড়ি দেবার জন্যে লোকটা সবে যখন ওকে গাধার পিঠে চড়তে সাহায্য করবে, মেয়েটা হঠাৎ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠলো। উদ্বিগ্ন-ব্যকুল স্বরে লোকটা জিগেস করলো—এ ব্যথাটার মানে কি বাচ্চাটা হবার সময় হয়ে এসেছে ? ও বললো ওর তা মনে হয় না। আসলে এ ব্যাপারে ও আদৌ সুনিশ্চিত নয়। ওর মনে হলো ঘণ্টা খানেক আগে যে ব্যথাটা উঠেছিলো, এটা অনেকটা তারই মতো। কিন্তু সে-কথা বলে বোঝার ওপর আরও বোঝা চাপিয়ে স্বামীকে ও ব্যাতিব্যস্ত করে তুলতে চায়নি। তাছাড়া, ও লক্ষ্য করলো যে শুকনো ধুলো তখন চারদিক ছেয়ে ফেলতে শুরু করেছে, যেখানে লোক চলাচল করছে না সেখানার হলুদ ঘাসের আগাগুলো এদিক ওদিক দুলছে। গরম বাতাস বইতে শুরু করেছে। এইভাবে বাতাস বইলে, উত্তপ্ত দমকা বাতাসের ঝাপটায় ধুলোর মেঘ যদি সব কিছুকে ঢেকে দেয়, তখন ওরা কি করবে ? ওর বাচ্চাটা জন্মাবে কেমন করে, কেমন করে ওরা নিজেরাই বা এর মধ্যে বেঁচে থাকবে ? ওর কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য স্বামীকে আগলে রাখা। স্বামী আর না জন্মানো শিশু—উভয়েরই প্রতি ওর মনোভাব মায়ের মতো। তাই পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, সবকিছু ও একাই মুখ বুজে সহ্য করবে।

সুতরাং ওরা আবার চলতে শুরু করলো। চাপাস্বরে স্বামীকে গুন-গুন করে একটা গানের সুর ভাঁজতে দেখে ও সত্যিই খুব খুশি হলো, মনে মনে ভাবলো তার বলিষ্ঠ, নিপুণ হাতদুটোর পক্ষে সে যথেষ্ট কাজই

সংগ্রহ করে নিতে পারবে। কিন্তু একটু পরেই লোকটার গান থেমে গেলো, কেননা বাতাসে ওড়া ধুলোর মেঘ ততক্ষণ তার নজরে পড়েছে এবং সারা পথ জুড়ে তার অন্যান্য সহযাত্রীরা দ্রুত পা চালিয়েছে, যেন ওরা হঠাৎ বুঝতে পেরেছে এ সময়ে খোলা রাস্তায় ক্যাটানোটা ঠিক নয়। ব্যাপারটা জরুরী বুঝতে পেরে সূর্যটাও যেন অসম্ভব ব্যস্ততার সঙ্গে অস্ত যাবার তোড়জোড় শুরু করে দিলো। পুবে, আকাশের প্রান্ত সীমা ভরে উঠেছে কালো মেঘে। সেই মুহূর্তে মেয়েটার তৃতীয়বার ব্যথা উঠলো এবং এবারে ও আর কিছুতেই মুখ বুজে সহ্য করতে পারলো না, যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো।

স্বামী ব্যস্ত হয়ে কাতর মিনতি করলো, 'লক্ষ্মীটি, সোনামণি, আর একটুখানি চলো—আর একটুখানি গেলেই তুমি দেখতে পাবে আমাদের জন্মভূমি।' উপত্যকার নিচে আশ্রয়-নেওয়া গ্রামটার দিকে নির্দেশ করে সে বললো। কিন্তু এটাও সে ভালো করে জানে তার বাবা-মা মারা গেছেন অনেক কাল আগেই, আজ তাদের সেই ভিটেতে যারা বাস করে তাদের কাউকে সে চেনে না। নিচের তলায় একটা ঘরের জন্যে হয়তো তাদেরই কারুর কাছে হাত পেতে মিনতি করতে হবে, নইলে বাচ্চাটা জন্মাবে কেমন করে! জীবনে সে নানা ধরনেরই কাজ করেছে, ছুতোর হিসেবে তার হাতের কাজের দক্ষতার সত্যিই কোনো তুলনা হয় না, কিন্তু জীবনে সে কখনও কারুর কাছে হাত পেতে ভিক্ষে চায়নি।

ওরা কোনো রকমে যখন গ্রামের সরাইখানায় এসে পৌঁছলো, চারদিক গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেছে, কানের কাছে শোনা যাচ্ছে ধুলোর মেঘে ওড়া উত্তপ্ত বাতাসের শন্‌শন্‌ শব্দ। এখন খানিকক্ষণ অন্তর অন্তরই মেয়েটার ব্যথা উঠছে এবং সেই যন্ত্রণাকে চেপে রাখার কথাও ও ভাবতে পারছে না, দাঁতে দাঁতে চেপে কেবলই গুঙিয়ে উঠছে। লোকটা ওকে গাধা থেকে নামতে সাহায্য করলো, তারপর—যেকোনো মুহূর্তে প্রসব হয়ে যাওয়ার যে ভয়ংকর দৃশ্য, যা অনেককেই হতবাক ও আতঙ্কিত করে তুলেছিলো—তাকে প্রায় এক রকম উপেক্ষা করেই,

বগলের নিচে দিয়ে ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে সরাইখানার দরজা পর্যন্ত নিয়ে যেতে সাহায্য করলো। কিন্তু ওদের ওই অবস্থায় দেখে সরাই-খানার মালিক নিজেই দৌড়ে এলো, অভ্যর্থনার পরিবর্তে দুহাত ছড়িয়ে দরজা আটকে দাঁড়ালো :

'উহুঁ, আমার এখানে জায়গা হবে না, সব ভর্তি হয়ে গ্যাছে।'

সরাইওয়ালার ঠিক পেছন থেকেই ভেসে আসছে সুস্বাদ খাবারের গন্ধ আর বাইরের ঝোড়ো বাতাসের হাত থেকে নিরাপদে আশ্রয় নেওয়া নারী-পুরুষদের হাসি ঠাট্টা গানের মিলিত উচ্ছ্বাস।

'আমি আপনাদের নিজেদের লোক,' ছুতোর করুণ স্বরে বললো। 'আমার স্ত্রীর যেকোনো সময় বাচ্চা হতে পারে। এ রকম অবস্থায় আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন?'

'কোথা থেকে আসা হচ্ছে?' সন্দিগ্ধ গলায় সরাইওয়ালা প্রশ্ন করলো।

'আমরা আসছি গ্যালিলি থেকে। সম্রাটের আদেশেই আমাদের এদিকে চলে আসতে হয়েছে।'

'হুঁ, তোমাদের দেখেই সেটা অনুমান করতে পেরেছি।' ছুতোরের আপাদ-মস্তক একবার ভালো করে দেখে নিয়ে সরাইওয়ালা রুক্ষ গলায় বললো, 'গ্যালিলির যত নোংরা, হাড়-বজ্জাত, বেজন্মা—সবাইকে আমি চিনি। তোমাদের মতো গ্যালিলির ওই বর্বর মানুষগুলো যদি না থাকতো, তাহলে দেশটা অনেক শান্তিতে বাস করতে পারতো। তোমরা কোনো কিছুতেই স্বস্তি পাও না; কেবল পাগলের মতো উদ্ভট উদ্ভট সব স্বপ্ন দ্যাখো—যা কোনোদিনই সত্যি হবে না। সব সময় কেবল মানুষের অধিকার নিয়ে চেঁচাও, কিন্তু অধিকার তো তোমাদের কেবল একটাই—বড় লোকদের ঘেন্না করা আর গরীবদের সঙ্গে গলায় গলায় দস্তি জমানো। আমি তো তোমার ঝোলাতে হাতুড়ি, বাটালি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার ধারণা তোমার কোমরে হয়তো ছুরিও গোঁজা আছে। তাছাড়া গ্যালিলির কোনো লোককে আমি এখানে জায়গা দিই না।'

'হ্যাঁ, ছুরি তো আছেই, তেমন কিছু ঘটলে টের পাওয়াতেও কোনো আপত্তি নেই!' মনে মনে ভাবলেও মুখে কিন্তু সে-কথা প্রকাশ করলো না, বরং শান্ত স্বরেই সে বললো, 'আমি খুব সাধারণ মানুষ, ছুতোরের ভালো কাজ জানি। আজ রাতটার মতো যদি আমার স্ত্রীকে একটু আশ্রয় দেন, যাতে ওর বাচ্ছাটা হতে পারে···এর মধ্যেই দু-তিনবার ব্যথা উঠে গ্যাছে···আমি আপনার কাছে সত্যিই ঋণী থাকবো এবং দু সপ্তা ধরে আপনার বাড়ির যাবতীয় কাঠের কাজ আমি সব করে দেবো।'

'আমার ঘর সব ভর্তি, কোথায় ওকে জায়গা দেবো বলো? তোমার কাছে টাকা-পয়সা কিছু আছে?'

তখনও যে তিনটে রূপোর মুদ্রা অবশিষ্ট ছিলো, ছোট থলিটা থেকে তা বার করে ছুতোর নিঃশব্দে সরাইওয়ালার দিকে এগিয়ে দিলো। সরাইওয়ালা মুদ্রা কটা তুলে নিয়ে বললো, 'এটা কোনো পয়সাই নয়। প্রতিদিন ভিখিরিদেরও এর চাইতে বেশি পয়সা আমি ছুঁড়ে দিই। কিন্তু যেহেতু তোমার স্ত্রীর অবস্থা খুব কাহিল, তুমি বরং ওকে আমার আস্তাবলে নিয়ে যাও।'

মনে মনে সত্যিই দমে গিয়ে ছুতোর দরজার সামনে শক্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু সরাইওয়ালা সটান তার মুখের ওপরেই দরজাটা বন্ধ করে দিলো। ছুতোর তখন কোনো কথা না বলে তার স্ত্রীকে আস্তাবলের দিকে নিয়ে চললো। গাধাটাও চললো তাদের সঙ্গে সঙ্গে।

ভাগ্য ভালো যে ওরা ঠিক সময়ে পৌঁছতে পেরেছিলো, কেননা তখন প্রচণ্ড বালির ঝড় উঠেছে, চাবুকের মতো শন্‌শন্‌ শব্দে আছড়ে পড়ছে ক্রুদ্ধ আক্রোশে। যাদের মাথার ওপর কিছু নেই, যারা আশ্রয় পায়নি, তারা সত্যিই হতভাগ্য। একদিক থেকে আস্তাবলটা খুব একটা খারাপ নয়, শুধু যা অসম্ভব গুমোট, বিষ্ঠা আর পশুদের গায়ের বিশ্রী দুর্গন্ধে ভরা। সেই দুর্গন্ধে মেয়েটির মনে হলো পেটের ভেতরের যাকিছু বুঝি সব উগরে আসবে, থর থর করে কাঁপতে লাগলো ওর সারা শরীর, একের পর এক ব্যথা ক্রমশ বেড়েই চললো। আর সারাক্ষণই মেয়েটির

পাশে পাশে রয়েছে ওর স্বামী—অসম্ভব ধৈর্যশীল, শান্ত আর ধীর স্বভাবের একটি মানুষ—রাগতে বা প্রতিরোধ করতে যার দেরি হয়, সারাটা জীবন যারা তাকে ঝড়ের মতো দ্রুত তাড়িয়ে নিয়ে ফিরলো, তাদের বিরুদ্ধে হাত তুলতেও সে দ্বিধা করে···

মাঝে মাঝেই রাখালরা এসে পশুদের আস্তাবলে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে, দুর্যোগের হাত থেকে সবকিছুকে রক্ষা করার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। এক সময়ে নবজাত শিশুর কান্না শুনে ওরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো। কে যেন একটা বাতি জ্বাললো। তারই প্রকম্পিত আলোর শিখায় জাবনার পাত্রের মধ্যে ওরা দেখতে পেলো সদ্যজাত শিশুটাকে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত বাবা-মাকে দেখতে পায়নি। ওরা অত্যন্ত সাধা-সিধে আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ। পশুরা যেমন বালির ঝড়কে ভয় পায়, ওরাও ঠিক তেমনি ভাবে সঙ্গে সঙ্গে কোনো কিছুকে ব্যাখ্যা করতে না পারলে তাকেই অলৌকিক বলে ধরে নেয়। তাই ওরা নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করতে লাগলো :

'ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো !'

'আস্তাবলে একটা বাচ্চা জন্মালো, অথচ তার মা নেই !'

'এটা নিশ্চয়ই পবিত্র শিশু !'

বিস্ময়ে আতঙ্কে ওরা যখন প্রায় বিহ্বল, যখন সবে ছুটে পালাতে যাবে, এক কোণের ছায়া থেকে আরও গাঢ়, বিরাট একটা ছায়া ওদের দিকে এগিয়ে এলো। ওদের দিকে তাকিয়ে ছায়ামূর্তিটা ক্লান্ত, ম্লান ঠোঁটে হাসলো। ওরা দেখলো লোকটা নিতান্তই সাধারণ একজন ছুতোর। ওদের মতো ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই এখানে আশ্রয় নিয়েছে।

পাত্র থেকে শিশুটাকে তুলে নিয়ে লোকটা ওদের বললো, 'ভয় নেই, আমরা কারুর কোনো ক্ষতি করবো না।'

'এটা পবিত্র শিশু···'

লোকটা বললো, 'শুধু এটা কেন, সব শিশুই পবিত্র।'

অন্ধকারে পথ দেখানোর জন্যে আলো ধরে ওরা লোকটাকে সাহায্য করলো, লোকটা বাচ্ছাটাকে ওর মার কাছে নিয়ে গেলো। তারপর ওদের ব্যাখ্যা করে বোঝালো কোথাও কোনো জায়গা না পেয়ে কিভাবে তারা এই আস্তাবলে এসে উঠছে এবং এখানে আশ্রয় না পেলে তারা হয়তো বাচ্ছাটাকে বাঁচাতেই পারতো না।

ওদের একজন বললো যে এটা নিঃসন্দেহে একটা শুভ লক্ষণ। সরল রাখালদের মধ্যে অন্য আর একজন জোর দিয়েই বললো :

'এবং এই ছেলে একদিন অনেক বড় কিছু করবে।'

'হ্যাঁ, অনেক বড় কিছু,' ছুতোর স্বীকার করলো। 'হয়তো ওর সেই সাহস হবে যা আমি করতে গেলে ভয় পেতুম। হয়তো এমনও হতে পারে—পিঠে চাবুক খাবার সময় যে চাবুক মারছে তার হাত থেকেই ও চাবুকটা কেড়ে নেবে। আর তেমনটা হওয়াই উচিত। কেননা, আমার দিক থেকে তাকে ছুতোরের কাজ শেখাবো, শেখাবো কি করে একজন ভালো কারিগর হওয়া যায়। আমি নিজে তাকে শেখাবো যা ঠিক তাকে ভালোবাসতে, যা ভুল তাকে ঘৃণা করতে। কিন্তু মুশকিল কি জানো—আমার চাইতে ভালো হবার সুযোগ ও কোনোদিনই পাবে না, কেননা কি করে বড়লোক হওয়া যায় তাতো আমি ওকে শেখাতে পারবো না।'

মেষ পালকরা ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলো, তবু কালো দাড়িওয়ালা দৈত্যের মতো অমন প্রকাণ্ড চেহারার লোকটার সম্পর্কে তাদের ভয় কিছুতেই গেলো না। ওদের একজন আস্তাবলের দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে কপাটদুটো একটু ফাঁক করলো। ঝড় থেমে গেছে, আকাশে ঝলমল করছে শুভ্র একটা চাঁদ আর অগনন নক্ষত্র। ভেড়াগুলোকে একত্রিত করে ওরা আবার তাদের চারণভূমির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চললো। কিন্তু ওরা সারাক্ষণই নিজেদের মধ্যে যা দেখেছে সে সম্পর্কে বলাবলি করতে লাগলো এবং ওটা তখনও পর্যন্ত ওদের কাছে একটা অলৌকিক ঘটনা বলেই মনে হলো।

ঘটনাটার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিলো, যার জন্যে ওরা সেটা স্মরণে রেখেছিলো—যদিও ওরা কোনোদিনই লোকটা বা বাচ্ছাটার মার নাম জানতে পারেনি, তবু ওদের স্মৃতিশক্তিরও তেমন কোনো তারতম্য ঘটেনি, যেমন ওরা কোনো দিনই ভেবে দেখতে চাইনি কোন্ শিশুটাকে ওরা স্মরণে রাখছে, কিংবা কত শিশু আস্তাবলে কিংবা কুঁড়েতে কিংবা খোলা মাঠে জন্মাচ্ছে। বুড়ো না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ওরা সবাইকে বার বার একই কাহিনী বলে যেতে লাগলো, কেননা ওটা ওদের জীবনে এমনই একটা মুহূর্ত যা ওদেরকে মহিমান্বিত করেছিলো, ওটা এমনই একটা মুহূর্ত যখন ওরা বুঝতে পেরেছিলো—যত ক্ষণস্থায়ীভাবেই হোক না কেন—ওটা নিজেই জীবনের একটা অলৌকিকতা, সেই দুঃখ যা একটা শিশুর মধ্যেও মুক্তি পায়, সত্যের জন্যে চিরন্তন সেই আশা যা নির্যাতীত মানুষের সমস্ত শিশুদেরই জন্মের অধিকার—অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদেরই কেউ একজন এই আশাকে পূর্ণ করার উত্তরাধিকার নিয়ে না আসছে।

মনে মনে যতটা কল্পনা করতাম, তাঁর সময়ে আমার বাবা যে তার চাইতেও বিশেষ কিছু ছিলেন, সে কথা জানতে পেরে আমি কখনও বিস্মিত হইনি। আমার ধারণা, কেবল একটা জিনিসই তিনি কখনও ছিলেন না—তা হলো বড়লোক। একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন যে ভু বছর কিংবা তার কাছাকাছি সময়, তিনি এক সময়ে ট্রামগাড়ির চালক ছিলেন। সে সময়ে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে সমস্ত নিউ ইয়র্ক জুড়ে ট্রামগাড়ি চালানো হবে। নিউ ইয়র্ক শহরে যে এক সময়ে ট্রামগাড়ি ছিলো, তার চাইতেও আমাকে যা বেশি বিস্মিত করতো তা হলো—তিনি এক সময়ে ট্রামগাড়ির চালক ছিলেন, যা এর আগে আমি আর কখনও শুনিনি। কিন্তু তিনি আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে ছিলেন যে বহুকাল আগে ট্রামগাড়ি ছিলো, দক্ষিণে বিয়াল্লিশতম সরণী থেকে সপ্তম এভিনিউ পর্যন্ত চালানো হতো।

অনেক বছর পরে সান ফ্রান্সিকোতে, সুন্দর একটা দিনের অনেকখানি সময়ই নব হিল থেকে টেলিগ্রাফ হিল পর্যন্ত ট্রামে চড়ে কাটিয়েছি। সেখানকার চারদিকের ছোট ছোট পাহাড় আর উপত্যকা-গুলো সত্যিই এমন সুন্দর যে পৃথিবীর অন্যান্য শহরের সঙ্গে সান ফ্রান্সিসকোর কোনো তুলনাই হয় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আমি ট্রামগাড়ির সেই চালককে লক্ষ্য করেছি, তিনটে দীর্ঘ হাতলের সাহায্যে কি আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গেই না সে গাড়িখানাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে। তখনকার দিনে যেটাকে মনে হয়েছিলো পৃথিবীর বিরল বিস্ময়, আজ আর তার কোনো অস্তিত্বই নেই।

সুতরাং আমার বাবাও এক সময়ে ট্রামগাড়ির চালক ছিলেন। তাঁর

ছিলো দীর্ঘ, সুন্দর, বলিষ্ঠ ছুটো বাহু। আমৃত্যু কাল পর্যন্ত তাঁর বাহুছুটো ছিলো পেশীবহুল, শীর্ণ অথচ লোহার মতো শক্ত। যখনই আমার বাবার কোনো স্মৃতি মনে পড়েছে, বরাবরই সবার আগে মনে পড়েছে তাঁর ওই হাতছুটোর কথা—যে হাতছুটো ছিলো একজন শ্রমজীবী মানুষের ; ও ছুটোই ছিলো তাঁর পাহাড়, তাঁর ভিত্তিভূমি, এবং এ পৃথিবীতে তাঁর নিজস্ব বলতে ছিলো কেবল ওই হাতছুটোই।

আমি সম্পূর্ণভাবে সুনিশ্চিত নই যে প্রথমে তিনি ঠিক কি কাজ করেছিলেন। তবে এটুকু জানি, আমার মতো তিনিও এগারো বছর বয়সে কাজ করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সতেরো বছর বয়েসের আগে পর্যন্ত তিনি যেসব কাজ করেছিলেন, সে সম্পর্কে আমাদের খুব কমই বলতেন। আমার ধারণা নিউ ইয়র্কের শহরগুলিতে তিনি কোনো আস্তাবলে কাজ করতেন—সেটা ১৮৮০ সালের কাছাকাছি—ঘোড়া দলাই-মলাই করতেন, গাড়ি ধুতেন, আরও নানান ধরনের কাজ করতেন।

সে সময়ে, কি বয়স্ক কি কিশোর, সবাইকে বারো ঘণ্টা কাজ করতে হতো, কখনও চোদ্দো ঘণ্টাও হয়ে যেতো। পনেরো বছর বয়েসে বাবা যখন একটা মিষ্টির দোকানে ঢুকেছিলেন, সকাল সাতটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত তাঁকে কাজ করতে হতো। তিনি শ্রমজীবী মানুষেরই একটি প্রজন্ম, যাঁর কাছে হাসি আর আনন্দ ছিলো অত্যন্ত ছুর্লভ, অস্বস্তিকর এক বস্তুর মতো—এবং তিনি যদি কখনও হাসতেন, সূর্যরশ্মি ভেঙে পড়ার মতো আনন্দ-উদ্ভাসিত তাঁর মুখের সেই অভিব্যক্তি আমি কোনোদিনও ভুলতে পারবো না। তিনি হাসছেন দেখে আমি আর আমার ভাই উচ্ছল খুশিতে ভরে উঠতাম।

তখন এমন একটা সময় ছিলো, যখন বাবাকে একটানা সাত মাস ধর্মঘট চালিয়ে যেতে হয়েছিলো। যখন ধর্মঘট ভাঙলো, তার জের যে কতদিন ধরে চলেছিলো আজ আমার আর স্পষ্ট মনে নেই। খাওয়া-দাওয়া, ঘরভাড়া নিয়ে পরিবারের এই যে বিরাট বোঝা, তাকে টানার

গুরুদায়িত্ব পড়েছিলো আমার আর আমার বড় ভাইয়ের ওপর, যাতে না আমাদের রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয়।

আমার বয়েস তখন বারো, আমরা দুজনেই খবরের কাগজ বিক্রির কাজ করি। সপ্তায় দুজনের গড়ে রোজগার হতো দশ ডলার। এর জন্যে আমাদের ভোর তিনটেয় উঠতে হতো, ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে অন্ধকারেই পোশাক পালটাতে হতো, তারপর অত্যধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত, ব্যথায়-বিষ শরীরটাকে টানতে টানতে নিয়ে যেতে হতো সেই কেন্দ্রে, যেখান থেকে সংগ্রহ করতে হতো আমাদের কাগজ। আমার মা অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন, ফলে আমার বাবাই ছিলেন একাধারে বাবা আর মা, ছোট ছোট তিনটি সন্তানের অভিভাবক—যাদেরকে তিনি কখনও পেট পুরে খেতে দিতে পারতেন না, যথেষ্ট পরতে দিতে পারতেন না এবং এই না-পারার অক্ষমতার জন্যে তিনি নিজেকেই অপরাধী বলে মনে করতেন।

কেবল শ্রমজীবী মানুষের আশ্চর্য সহযোগিতার মনোভাবই আমাদের একত্রে নিবিড় বন্ধনে বেঁধে রাখতো। প্রতিদিন রাতে আমাদের কাজে বেরোনোর আধ ঘণ্টা আগে তিনি উঠতেন, প্রাতরাশ বানাতেন, আস্তে আস্তে আমাদের জাগিয়ে তুলতেন, আমাদের পোশাক পরতে সাহায্য করতেন, প্রাতরাশ সাজিয়ে দিতেন, এমন কি আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়াটাও নির্নিমেষ চোখে লক্ষ্য করতেন—তখন তাঁর মুখে যে নিঃশব্দ যন্ত্রণার ছায়া ফুটে উঠতো, একমাত্র গরীবরাই কেবল তা চিনতে পারতো, আর একবার চিনতে পারলে গরীবরা তা কোনোদিনই ভুলতে পারতো না।

সত্যিই আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না যে আমার বাবা কোনোদিন তরুণ ছিলেন এবং তিনি যখন তাঁর যৌবনের দিনগুলোর কথা বলতেন, আমার বরাবরই মনে হতো তিনি যেন তৃতীয় কোনো ব্যক্তির বর্ণনা দিচ্ছেন। এমন বহু মানুষ আছেন যাঁরা বরাবরই যুবক থেকে যান, মরার সময়েও তাঁদের যৌবনকে ধরে রাখতে পারেন, এমন কি যদি তাঁরা আশি বছর পর্যন্ত বাঁচেন, তবুও। কিন্তু আমার বাবা তাঁদের মতো

ছিলেন না—যদিও তাঁর শরীর থেকে যৌবন বিদায় নেয়নি, তাঁর চলা-ফেরাতেও কোনো জড়তা ছিলো না, আর বিস্ময়কর ছিলো তাঁর শারীরিক ক্ষমতা, বিশেষ করে তাঁর লোহা-পেটা কামারের বলিষ্ঠ হাতদুটোয়।

সে সময়ে, শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে, নিউ ইয়র্ক তো বটেই, আমেরিকার অন্যান্য শহরেও পেটা লোহার চাহিদা ছিলো অসম্ভব। নানা ধরনের কারুকার্য করা ছাড়াও, ঘোড়ার গাড়ি, নাল, বগি, বাগান ঘেরার রেলিং প্রভৃতি হাজারো কাজে পেটা লোহা ব্যবহার করা হতো। বেশির ভাগ সময়েই কাঠকয়লার গনগনে আগুনে লোহাকে পুড়িয়ে লাল করে নেহায়ের ওপর হাতুড়ি পিটে পিটে তবেই নির্দ্দিষ্ট একটা আকারে রূপ দেওয়া সম্ভব হতো। এর জন্যে প্রয়োজন হতো কামারের বলিষ্ঠ বাহু আর সুদীর্ঘ দিনের নিপুণ অভিজ্ঞতা। নদীর নিম্ন অববাহিকার পুব পশ্চিম উভয় তীরেই গড়ে উঠেছে অগনন কামার-শালা, ঘোড়ার খুরে নাল লাগানো আর কাঠের চাকায় লোহার বেড় পরানোই যাদের মূল পেশা।

বাবা আমাকে বলতেন, যখন তিনি কিশোর ছিলেন তখন স্বর্গের নন্দন-কাননে থাকার চাইতে কামার শালার ছাউনির নিচে থাকাটাকে কত বেশি পছন্দ করতেন, দুপুরে খাবার সময় কামারশালটার খোলা আঙিনায় কেমনভাবে স্যাণ্ডউইচ আর এক পাত্তর বিয়ার নিয়ে উবু হয়ে বসে থাকতেন, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন দীপ্ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠা গনগনে আগুনের শিখা, কান পেতে শুনতেন হাপরের হিস্‌হিস্ আওয়াজ আর হাতুড়ির ভয়ঙ্কর বিচিত্র সব শব্দ।

প্রথমে তিনি কামারশালায় ফাইফরমাস খাটার ছোকরা হিসেবে নিযুক্ত হয়ে ছিলেন—লোহার টুকরো বওয়া, কামারের রাক্ষুসে তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে বারবার শুঁড়িখানায় মদ আনতে ছোটা থেকে শুরু করে নানা ধরনের টুকিটাকি কাজ। তারপর তিনি টংগ-বয় বা সহকারী হয়েছিলেন, অর্থাৎ তখন তাঁর কামার যেসব যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতো

সেসব ধরা, ছোঁয়া বা সরানোর অধিকার ছিলো। অবশেষে তিনি চামড়ার সজ্জাবরনীপরা পরিপূর্ণ কামার হতে পেরেছিলেন, যাঁর হাতুড়ির ঘায়ে গনগনে লাল উত্তপ্ত লোহা নির্দ্দিষ্ট একটা রূপ পেতো।

যদিও ওইভাবে লোহাকে নির্দ্দিষ্ট রূপ দেওয়ার পদ্ধতি আজও পৃথিবীর বুক থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, তবু অনেক পরে, শেষ পর্যন্ত যখন বুঝতে পেরেছিলাম, তখন আমি প্রায়ই অবাক হয়ে ভাবতাম—তাঁর মতো অমন বুদ্ধিমান, নিপুণ দক্ষতার একজন মানুষ কেন নিজের হাতদুটো ছাড়া আর কোনোকিছুর ওপরেই তেমন নির্ভর করতে পারতেন না। পেটা লোহার চাহিদা কমে যাওয়ার পর তিনি টিন মিস্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু কৌটো, জল রাখার পাত্র বা ঘর-ছাউনির কাজে টিনের প্রয়োজনের তুলনায় খনিজ-উৎপাদন অনেক কম হতো বলে সে কাজেও তিনি বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি। সে সময়ে নিউ ইয়র্ক শহরে যে ব্যবসাটার চাহিদা উত্তরাউত্তর বেড়ে চলেছে, তিনি তার দিকে নজর রেখেই পোশাক তৈরির একটা কারখানায় কাপড় কাটার কাজ নিলেন। বিশেষ পেশার এই কাজটা তাঁকে নতুন করে শিখতে হলো এবং সেটা তিনি বেশ ভালোভাবেই শিখেছিলেন। এই তিনটে কাজের মাঝে আরও কত ধরনের যে কাজ করেছেন কে জানে। আমি তাঁকে রঙের কাজে ঠিক মজুর হিসেবে কাজ করতে দেখেছি, আমি নিজেও একবার তার সঙ্গে জলের নল সারানোর কাজ করেছি। তাঁর অসম্ভব দক্ষ হাতদুটোর তুলনায় নিজেকে আমার ভীষণ অযোগ্য মনে হতো। তাঁর ধৈর্য্য ছিলো অপরিসীম, মেজাজ ছিলো সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়েরই মতো প্রলম্বিত। তাঁর কেবল একটাই মাত্র ত্রুটি—পয়সা রোজগারের অসৎ উপায়গুলো ছিলো অজানা।

নিতান্ত শৈশবেই আমার মা মারা গিয়েছিলেন। ছোট ছোট তিনটি সন্তানকে লালন-পালন করার মতো জটিল দায়িত্বভার এসে পড়েছিলো আমার বাবার ওপর। আমার ধারণা মা মারা যাবার আগেও আমরা গরীব ছিলাম, কিন্তু দারিদ্রের নগ্ন মুখে মুখোশ পরিয়ে রাখার মতো

অসীম দক্ষতা ছিলো যার—আমার বাবা একা কোনোদিনই তা পারেন নি। দিনে বারো চোদ্দ ঘণ্টা তিনি মুখ বুজে খেটে যেতে পারতেন, অথচ আমাদের নিয়মিত দু-মুঠো অন্ন জোটাতে পারতেন না, পরাতে পারতেন না এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকশ্রেণীর বাবারা যেমন তাদের সন্তানদের শৈশব বিকিয়ে দেন, তিনিও ঠিক তেমনিভাবে আমাদের শৈশবকেও বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমার বড় ভাই কাজে লেগেছিলো যখন তার বয়েস বারো, আর আমি এগারোয়। শুধু যে সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির জন্যেই ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়তাম তা নয়, খেলাধুলো আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতাম বলেও বিমর্ষ হয়ে পড়তাম। সম্ভবত সেদিন থেকেই আমার বাবা বুড়িয়ে গিয়েছিলেন—যেমন ভাবে একদিন নিজের যৌবনকে বিকিয়ে দিতে হয়েছিলো, ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের যৌবনও বিকিয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি সব সময়েই বিষণ্ণ হয়ে উঠতেন। তাঁকে দেখে মনে হতো শুধু দেহখানাই আছে, তাতে কোনো প্রাণ নেই।

আমার কালে এমন একটা সময় ছিলো, যখন সারা দেশে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটা ছিলো জনপ্রিয়তা থেকে অনেক দূরে, আর 'সাম্যবাদ' শব্দটা উৎকীর্ণলিপির চাইতে একটু ভালো। কিন্তু ষোলো বছর বয়েসের আগে পর্যন্ত ওই শব্দগুলো কখনও শুনেছি বলে অন্তত আমার মনে পড়ছে না, আর যদি শুনেও থাকি—আমার কাছে তার বিশেষ কোনো অর্থ ছিলো না। আমি জানতাম যে 'বলশেভিক' শব্দটা অশ্লীলতারই একটা বিশেষ গুণ বা রূপান্তর। অবশ্য এটাও ঠিক—লুঠ-তরাজ, দারিদ্র আর খুন-খজমের নিষ্ঠুরতম বর্ণনাও আমার বাস্তব অভিজ্ঞতাকে তেমন নাড়া দিতে পারতো না, কেননা ওসব কিছু থেকে যতটা সম্ভব বিচ্ছিন্ন থাকতেই বেশি অভ্যস্থ ছিলাম।

আমি তখন নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরিতে সংবাহকের কাজ করি, মাইনেও খুব ভালো—প্রতি ঘণ্টায় বাইশ সেণ্ট। সে সময়ে অজস্র

লোকের যখন কোনো চাকরিই নেই, আমি তখন বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও একের পর এক, প্রায় গোটা বারো চাকরি ছেড়েছি আর ধরেছি। বাবার ইচ্ছে সুন্দর কোনো পেশার ওপরেই আমি যেন যোগ্যতা অর্জন করতে পারি, কিন্তু বই ছিলো আমার সব চাইতে প্রিয়। বইয়ের আশেপাশে ঘুরতে, তাদের নাড়াচাড়া করতে, পড়তে আমি বেশি ভালোবাসতাম। বইয়ের আকারে যাকিছু হাতের কাছে পেতাম, পড়ে ফেলতাম। সেই সময়েই গ্রন্থগারিক মহিলাটি আমাকে জর্জ বার্নাড শ'র "ইনটেলিজেন্ট উমেনস্ গাইড টু সোস্যালিজম অ্যাণ্ড ক্যাপিটালিজম" বইটা পড়তে দিয়েছিলেন।

উনি যে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে বইটা আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন তা কিন্তু নয়। সম্ভবত উনি আমার ওপর কিছুটা আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, কেননা একবার কেনই যেন ওঁকে বলেছিলাম যে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে আমি গল্প লিখি। আমি একবার ওঁকে কয়েকটা গল্প পড়তেও দিয়েছিলাম। উনি লক্ষ্য করেছিলেন যে ওইসব গল্পের কোনোটাই আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক নয়। আমি তখন ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার বৃত্তপথটাকে বোঝার বিশেষ কোনো ক্ষমতা বা রীতি আমার নেই। তখন আমার আকাঙ্খাকে নিবৃত্ত করার জন্যে উনি ছোট ছোট কয়েকটা প্রবন্ধ আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে জর্জ বার্নাড শ'র ওই বইটাও ছিলো।

"সমাজতন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের প্রতি প্রতিভাময়ী নারীদের নির্দেশ" নামটা আমার ভালো লাগেনি। নামটার কথা মনে পড়লেই কেমন যেন লজ্জা পেতাম। আমি তখন সবে সতেরোয় পা দিয়েছি, কিন্তু সেই আমি যে নিজের প্রত্যহিক রুটি নিজেই রোজগার করি, নিজের অস্তিত্বকে টিঁকে রাখার জন্যে প্রতি মুহূর্তেই সংগ্রাম করি, রক্তে অনুভব করি রুক্ষ কদর্যতা, নিজেরই জনারণ্যে মুখোমুখি হই শত্রুর, বস্তি জীবনের কোনো অশ্লীল শব্দই যখন আমার অজানা নয়, বাস্তব জীবনের স্খলিত শিথিল অভিজ্ঞতার সঙ্গেও আমি যখন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তখন

অবাক হয়ে না ভেবে পারিনি ওই যে বিশেষ বইটার 'প্রতিভাময়ী নারীদের' কাছ থেকে আমার আর বিশেষ কিই বা শেখার আছে!

কিন্তু শিখেছিলাম। সেদিনই রাত্রে, পারিবারিক জীবনের যে মিলন-স্থল, রান্নাঘরের সেই টেবিলে বসে আমি বইটা পড়তে শুরু করেছিলাম। একটু পরেই দেখলাম আমার বাবা আর দু-ভাই ঘুমে ঢুলতে শুরু করেছে। ওরা শুতে যাবার পরেও আমি বসে বসে পড়ছিলাম এবং পড়েছিলাম আকাশে ভোরের আলো ফুটে না ওঠা পর্যন্ত। কেমনভাবে আমি বেঁচে ছিলাম, কেমনভাবে বেঁচে আছি, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাচ্ছি— এই সব অসংলগ্নতা ভেঙে যুক্তির দীপ্ত ঝলকে সেই প্রথম পৃথিবীটা আমার চোখের সামনে নাচতে নাচতে ছুটে চলেছিলো।

তবু জর্জ বার্নাড শ নন, কিংবা স্নেহপরায়না সেই গ্রন্থাগারিক, যিনি 'নিরপেক্ষতার পথ' থেকে আমার মনকে ফেরাতে চেয়েছিলেন, যিনি শ্রেণী-নির্যাতন এবং শ্রেণী-বিচারের একজন শত্রু হিসেবে আমাকে ফেরাতেও পেরেছিলো, তিনিও নন— কেবল ওঁরাই যে দেখিয়েছেন আমার দেহ-মনের দারিদ্র্য আর ক্ষুধা, আমার ছিন্নবাস, জীর্ণ জুতোই যে আমাকে শোকসন্তপ্ত করে তুলেছে, কিংবা অতর্কিতে হানা দিয়েছে ছলনাময়ী নিয়তি, তাই নয়—বরং বলতে গেলে আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী আর মূল্যবান যে সৃষ্টি, সেই শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গেই জড়িত থাকার জন্যে আমাকে যে মূল্য দিতে হয়েছিলো, তার ভূমিকাও কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। তবু জর্জ বার্নাড শ আমার চিরকালের সেই প্রিয় স্মৃতি, আমার চেতনাহীন ঘৃণাটাকে নির্দ্দিষ্ট একটা রূপ দিয়ে ছিলেন, তাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন, তাকে পরিচালিত করতে পেরেছিলেন মননের উৎসে, যুক্তি আর সৃষ্টির পথে।

তবু আমার বাবাকে, নানা দিক থেকেই যিনি তুলনাবিহীন, বলিষ্ঠ, বিচক্ষণ আর ধৈর্যশীল, যাঁর হাতদুটো যাদু দিয়ে গড়া, যাঁর হৃদয় বিশাল আর কখনও ভাঙা যায় না এমনই নিটোল, যিনি সব সময়েই নিজের

দারিদ্র দিয়ে বিচার করতে গিয়ে নিজেকে ছোট করে ফেলতেন— শ্রমিকশ্রেণীর মানুষদের মধ্যে তিনি যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ, এ কথা আমি যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে কোনোদিনই তাঁকে বোঝাতে পারিনি। শ্রমিক-শ্রেণীর মানুষ যে ভালো, বলিষ্ঠ আর উন্নত, এই কথা তাঁকে গভীর ভাবে আহত করতো, এমন গভীর আঘাত করতো যে তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে চাইতেন না যে এর চাইতে সম্ভাব্য ভালো কোনো পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সামান্যতমও কোনো যোগাযোগ আছে। এটাই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্যর্থতা।

আমি বারবার বোঝাতাম যে এটা তাঁর ব্যর্থতা নয়। শ্রমিক কি— তিনিই প্রথম আমার চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলেছিলেন এবং আমৃত্যু তা কখনও আমার কাছে এতটুকু ম্লান হয়নি। কখনও কখনও সমাজ বিবর্তনের ধারা, তার তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা তিক্ত বিতর্ক জুড়ে দিতাম, কিন্তু কোনো কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারতো না—তিনি নিজেই ছিলেন দীর্ঘতম বিতর্ক, যিনি নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে আমাকে শিক্ষা দিতেন।

তিনি মনে প্রাণে চাইতেন আমি লেখক হই। তাঁকে ছাড়া আমি কোনোদিনই সাহিত্যিক হতে পারতাম না। যিনি লেখাপড়া প্রায় জানেন না বললেই চলে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, রাতের পর রাত, তিনি বিহ্বল-আতঙ্কে চুপচাপ বসে থাকতেন আর আমি পাতার পর পাতা লিখে যেতাম। তারপর জোরে জোরে তাঁকে আর আমার ভাইদের পড়ে শোনাতাম। গল্পগুলো ছিলো দুর্বল, আশ্চর্য করুণভাবেই দুর্বল, তবু আমি সাহিত্যিক হয়েছিলাম যেহেতু তিনজন মানুষ, যারা প্রতিদিন রাত্রে আমি যা লিখতাম মন দিয়ে শুনতো, যারা ভাবতো গল্পগুলো হয়তো তেমন বাজে নয় কিংবা আমার লেখা কেবল শব্দপুঞ্জগুলোই তাদের কাছে একটা অলৌকিক কিছু বলে মনে হতো। তার মানে এই নয় যে আমার বাবার সাহিত্য-বিচার ছিলো দুর্বল, বরং তাঁর বোধ, তাঁর হিতাকাঙ্খা, সাহিত্য-বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারের চাইতে অনেক অনেক বেশি গভীরে প্রবেশ করতে পারতো।

তিনি মারা যাবার অল্প কয়েকদিন আগে আমার 'শেষ সীমান্ত' উপন্যাসখানা প্রকাশিত হয়েছিলো, যার উৎসর্গ পত্রে লিখেছিলাম—"আমার বাবাকে, যিনি আমাকে অতীতে যে আমেরিকা ছিলো, শুধু তাকে নয়—ভবিষ্যতে যে আমেরিকা হবে, তাকেও ভালোবাসতে শিখিয়ে ছিলেন।" বাবা তখন বৃদ্ধ, বয়েসের তুলনায় অত্যাধিক পরিশ্রম আর ভাবনা-চিন্তায় তিনি তখন আরও বেশি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, ভগ্ন স্বাস্থ্য, অসুস্থ—অবাক হয়েই আমাকে জিগেস করেছিলেন, উৎসর্গ পত্রে আমি যা লিখেছি তার অর্থ কি? যদিও তিনি নিঃসন্দেহে মনে মনে খুশি হয়েছিলেন, তবু যা বলতে চেয়েছিলেন, অতীতে যে আমেরিকা ছিলো তার সম্পর্কে তিনি খুব অল্পই জানতেন আর ভবিষ্যতে যে আমেরিকা হবে সে সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা নেই বললেই চলে।

আমি তাঁকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারিনি যে তাঁর মধ্যে, এমন কি তিনি নিজেই সেই আমেরিকা যা হবে এবং আমার ধারণা অজস্র ক্রুদ্ধ বছরগুলোতে আমার যাকিছু ক্রোধ, তার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী যেটা সেটা তিনি, যিনি নানা দিক থেকে সত্যিই অনন্য সাধারণ, লুঠ করে নেবার মতো তাঁর যে দুর্লভ সম্পদ—তাঁরই প্রজন্মের লক্ষ লক্ষ মানুষের গর্ব আর অভিজ্ঞতা দিয়ে সৃষ্টি যে বলিষ্ঠ দুটো বাহু, তা দিয়েই তিনি গড়ে তুলেছেন অতীত আমেরিকার যাকিছু ভালো আর প্রকৃত সত্য।

লেখক পরিচিতি

শুধু আমেরিকা নয়, আধুনিক বিশ্বেরও অন্যতম লব্ধ প্রতিষ্ঠিত এবং বিতর্কিত সাহিত্যিক হাওয়ার্ড ফাস্ট, যিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, গল্পকার, কবি, নাট্যকার এবং সাহিত্য সমালোচক। জন্ম ১৯১৪ সালে নিউ ইয়র্ক শহরের একটি শ্রমিক পরিবারে। শৈশব কাটে দুর্বিসহ এক দারিদ্রের মধ্যে। পারিবারিক প্রয়োজনেই তাঁকে মাত্র এগারো বছর বয়েসে কাজে যোগ দিতে হয়। খবরের কাগজ বিক্রি করা থেকে শুরু জলের কল সারানো মিস্ত্রির সহকারী পর্যন্ত, কয়েক বছরে হেন কাজ নেই যা তাঁকে করতে হয়নি। শিল্পের মন্দার সময়ে, মাত্র সতেরো বছর বয়েসে রুজি-রোজগারের সন্ধানে নিউ ইয়র্ক ছেড়ে পাড়ি দেন বিদেশে। এই সময়েই আমেরিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশ বিস্তীর্ণভাবে ঘুরে বেড়াবার অবকাশ পান। চরম হতাশা আর দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটলেও, সাধারণ মানুষের স্বপক্ষে, বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই হাওয়ার্ড ফাস্ট একের পর এক রচনা করতে থাকেন অজস্র ছোট গল্প, কবিতা, আর উপন্যাস, যা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও বই আকারে প্রকাশিত হবার তেমন সুযোগ হয়ে ওঠেনি। ১৯৩৩ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুই উপত্যকা' যখন (সম্ভবত মেক্সিকো থেকে) প্রকাশিত হয়, হাওয়ার্ড ফাস্টের বয়েস তখন মাত্র উনিশ। চাকরি-বাকরির ব্যাপারে তেমন সুবিধে করতে না পেরে কয়েক বছর বাদে আবার দেশে ফিরে আসেন এবং আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এর জন্যে তাঁকে বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, কারাবরণ করতে হয়েছে একাধিকবার। আমার যতটুকু মনে পড়ছে, সম্ভবত তিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধেও যোগ দিয়েছিলেন। একদিকে সাধারণ মানুষ—তাদের দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা-সংগ্রাম যেমন তাঁকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে, অন্য দিকে তেমনি মানব-সভ্যতার প্রাচীন সংস্কৃতি আর গৌরব দিয়েছে তাঁকে গভীর ব্যাপ্তি ও মননের সূক্ষ্মতা। ফলে সব মিলিয়ে, অ্যালবার্ট মালজ এবং হাওয়ার্ড ফাস্ট—আমেরিকার এমনই দুর্লভ দুই সাহিত্যিক—যাঁদেরকে এক শ্রেণীর মানুষ ভালোবেসেছে হৃদয় দিয়ে, অন্যেরা

হেলায় উপেক্ষা করেছে। অথচ ভাবতেও অবাক লাগে—ফাস্টের এক একটি উপন্যাস যখন বিক্রি হয়েছে লক্ষ লক্ষ কপি, অনূদিত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায়, তখন আমেরিকার প্রতিনিধিস্থানীয় প্রথম শ্রেণীর বহু সংকলনে এমন কি নরমান ফরেস্টার সম্পাদিত প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠার একটি দুর্লভ সংকলন—'আমেরিকান পয়েট্রি অ্যাণ্ড প্রোস'-এতেও হাওয়ার্ড ফাস্টের নামের কোথায় কোনো উল্লেখ নেই। এত স্বল্প পরিসরে হাওয়ার্ড ফাস্টের জীবন বা তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা আমার পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব নয়। তাই ১৯৭১ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত চিলির বিখ্যাত কবি পাবলো নেরুদার ভাষায় শুধু এইটুকু বলতে পারি:

আমি তোমার সঙ্গে বলছি হাওয়ার্ড ফাস্ট
তুমি এখন কারাগারে।
আমি তোমাকে আলিঙ্গন করছি, অন্তরঙ্গ সাথী আমার,
ভাই আমার, আমি তোমাকে সুপ্রভাত জানাচ্ছি।

আমি দেখেছি স্পেনের রুদ্ধদ্বার, দেখেছি স্পেনেরই আলোয় অভিষিক্ত এক কবিকে
যার মাথাটা এখন গড়াচ্ছে অন্ধকার ছায়ায়
আর রক্তলোলুপ পশুরা ঝুঁকে রয়েছে তার ওপর।...

হাওয়ার্ড ফাস্ট, তুমি এখন কারাগারে বন্দী।
তোমার বই দাউ দাউ বহ্নিশিখার মতো একের পর এক
উদ্ভাসিত করে তুলেছে আমেরিকার জনজীবন।
তুমি লিখেছো বীর নিগ্রোদের কথা,
সেনাধ্যক্ষ আর গরীবদের কথা,
শহর আর স্বাধীনতার কথা।
আজ তুমি গৌরবান্বিত বন্ধুদের সাথে কারাগারে বন্দী,
আর তোমার মাথার ওপরে ঝরে পড়ছে সেই একই গাঢ় তুষার
একদিন যা ঝরে পড়তে দেখেছি স্পেনের বুকে,
সেই একই রাত্রি, একই ছায়া, একই রক্ত।

হে আমার স্বদেশভূমি, নম্র আর বিশাল,
হে আমার তারুণ্যের দীপ্ত অভিজ্ঞান,

পৃথিবীকে রাশি রাশি উপহার দেবে বলে
গমের ক্ষেতে দাঁড়ানো কৃষাণের মতো তুমি স্পন্দিত হয়ে ওঠো!

স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো উত্তর আমেরিকা, আজ তুমি নিজেকে হঠাৎ
দুর্গন্ধময় আবর্জনার স্তূপে পরিণত করেছো,
লুব্ধ পশুর মতো গ্রাস করছো অন্যকে।
তোমার চারপাশ ঘিরে অবিশ্বাসের গাঢ় অন্ধকার,
অনুসন্ধানের ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ, গেস্টাপোর পুনরুত্থান,
ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত আর পুলিসী সন্ত্রাস।
শিশির-ভেজা উদ্যানে যেখানে একদিন সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো
জেফারসনের উদাত্ত কণ্ঠস্বর,
আজ সেই ভয়ঙ্কর প্রান্তরে
উন্মত্ত শেরিফ ঘোড়ার পিঠে চড়ে বিধ্বস্ত করছে যত পাঠাগার,
আর নিকারাগুয়ার শ্রমিক-ইউনিয়নের সদস্যদের
খুন করার জন্যে পাঠানো হচ্ছে রাইফেল।

হাওয়ার্ড ফাস্ট, যে সন্ত্রাস তীক্ষ্ণ-ফলা ছুরির মতো চিলিকে
ছিঁড়েছুঁড়ে তছনছ করছে,
গোয়েবেল আর সমোজার সেই নিদারুণ বিষ, সেই অপকীর্তি
গ্রীসকে ডুবিয়ে দিচ্ছে গাঢ় অন্ধকারে।
আজ ওরা তোমার মাথার ওপর দিয়ে
ছুটিয়ে দিয়েছে তাদের হাজারো অশ্বারোহী সৈনিক
তোমার দেশকে লুঠ করবে বলে।
আর সেই ঘাতকরাই তোমাকে চিহ্নিত করেছে,
ওরা চায় তোমার মহান রচনা-সম্ভারকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে।
এ সবকিছুই আমরা জানি,
জানি এর চাইতেও অনেক অনেক বেশি কিছু,
কিন্তু আজ আমরা ওদের জন্যে ঠিক প্রস্তুত নই।

যারা তোমাকে ভালোবাসে হাওয়ার্ড ফাস্ট
তারা পৃথিবীর সব প্রান্তেই ছড়িয়ে আছে।